পয়লা এপ্রিল

কানাই বসু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

পিতৃদেব

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রলাল বসু

শ্রীচরণকমলেষু—

আমার সব কিছুর মতো, আমার সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-বুদ্ধি তাঁহারই দান

সম্প্রতি শুনিলাম, আমার "বিবাহের দিন" গল্পের সঙ্গে কী একটি বিদেশী গল্পের নাকি সাদৃশ্য আছে। ইহা আনন্দের কথা। লেখক যিনিই হোন, আমার বিশ্বাস তিনি মনীষি ব্যক্তি (great man) ; এবং যেহেতু তিনি ও আমি সমভাবের ভাবুক, অতএব—

কিন্তু স্বার্থপরের ন্যায় কেবল নিজের আনন্দটুকুই দেখিলে চলিবে না। ইহাতে যে দুশ্চিন্তারও কারণ রহিয়াছে। দুশ্চিন্তা সেই বিদেশী ভদ্রলোকের জন্য। বিজ্ঞ সমালোচকের হাতে পড়িয়া, আজই হোক বা শতবর্ষ পরেই হোক, আমার কর্মের দায় তাঁহার স্কন্ধে গিয়া না পড়ে! সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিতেছি, "বিবাহের দিন"-এর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহাকে যেন কেহ দায়ী না করেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি অপরাধের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দেশী বিদেশী কত সুসাহিত্যিক রহিয়াছেন ও ছিলেন। তাঁহাদের কাহারও ভাব বা ছায়া অবলম্বন না করিয়াই গল্প রচনা করিবার হঠকারিতা সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।

৯৩১, সার্পেন্টাইন লেন
কলিকাতা,
কার্ত্তিক, ১৩৫০

কানাই বসু

পয়লা এপ্রিল

আড্ডা আজ আর জমিবে না। একে চৈত্র মাসের নিদারুণ গরম, তাহার উপর আড্ডাধারী অবিনাশের যে রকম মেজাজ দেখা গেল, তাহাতে আজ যে আড্ডা জমিবার আর আশা নাই তাহা সকলেই বুঝিলাম। সিধু আমাদের দিকে চাহিয়া ঠোঁট মচ্‌কাইল। পুলিন ডাক্তার ও আমি হাত উল্টাইয়া ও ঘাড় নাড়িয়া তাহা সমর্থন করিলাম। এ সকলই ঘটিল অবিনাশের অগোচরে। সে তখনও তাহার ছেলে সুবোধকে বকিয়া চলিয়াছে।

সুবোধ অবশ্য ঘরে নাই। হয়তো বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যেও সে নাই। কিন্তু তাহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। ঘরের মেজেতে একপাটি বিবর্ণ ও বিকৃত নাগরা জুতা পড়িয়া আছে।

বছর দশ এগারোর ছেলে সুবোধ। কিন্তু অবিনাশ বলে শয়তানের বয়সও নাই, জাতিও নাই। নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা অবিনাশের কাছে তাহার ছেলের শয়তানত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার নবতম শয়তানীর কাহিনী শুনিলাম।

গতকাল রাত্রে অবিনাশের এক নব-বিবাহিতা ভাইঝি ও তাহার স্বামী এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসে। আজ সকালে জামাই আহারাদির পর অফিসে যাইবার সময়ে তাহার জরিদার নাগরার একপাটি পায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জুতা যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন আর তাহার পদস্থ হইবার অবস্থা নাই। ভেলভেটের নাগরা সারা সকাল চৌবাচ্ছায় অবগাহন করিয়া যতই কোমল ও শীতল হোক, জামাতা বাবাজী তাহাকে পদচ্যুত করিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া খুড়শ্বশুর মহাশয়ের তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা, এক সাইজ বড় হওয়া সত্ত্বেও, পরিয়া অফিসে গিয়াছে। অফিসের ফেরৎ আবার এ বাড়ীতে আসার কথা ছিল, কিন্তু জামাতা আসে নাই। সুবোধের মা বলিতেছেন, জামাই নিশ্চয় রাগ করিয়াছে। সুবোধের মা আরও বলিয়াছেন, এক জোড়া ভালো জুতা কিনিয়া জামাইকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

অফিস হইতে ফিরিয়া অবিনাশ সুবোধের দুষ্কৃতির কাহিনী শুনিয়াছে। শুনিয়া চটিয়াছে, কিন্তু ক্ষেপিয়াছে সুবোধের মায়ের অবোধ আচরণে। ছেলের নিন্দা তিনি অবশ্য যথেষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সিল্কের পাঞ্জাবি, জরিপাড় চাদর ও তালিমারা ঢিলা ক্যাম্বিশ জুতার সজ্জায় সজ্জিত জামাতার কথা বলিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতেই অবিনাশ ক্ষেপিয়াছে। সুবোধ তাহার রসবোধ পাইয়াছে তাহার মায়ের কাছ হইতে, তাহা আমরা জানিতাম। অবিনাশের চরিত্রে ও-দোষের লেশমাত্র নাই।

সকল রকম পরিহাস, উপহাস ও রস-রসিকতার উপর সে খড়্গ-হস্ত। এ সম্বন্ধে তাহার একটি নিজস্ব মৌলিক মতবাদ বা pet theory আছে। সে বলে, পরিহাস বিনামূল্যে হয় না। পরিহাস করিতে গেলে তাহার

দাম দিতে হইবেই। যে পরিহাস করে, যাহাকে পরিহাস করা হয় এবং যাহারা সেই পরিহাস উপভোগ করিয়া আনন্দ পায়, ইহাদের কাহারও না কাহারও উপর দিয়া দাম আদায় হইবেই।

এতক্ষণ অবিনাশের কথাই বলা হইল। কিন্তু অবিনাশই সব নহে। আড্ডার রসদ—চা, পান, সিগারেট ও এটা ওটা ভাজা ভুজি—সে-ই জোগাইলেও, এক তাহাকে লইয়াই কিছু আড্ডা নহে। আমরাও আছি। পরিহাসের কথায় পুলিন ডাক্তারের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল কাল পয়লা এপ্রিল। পয়লা এপ্রিল বৎসরে একবারের বেশী আসে না, অতএব উহার সদ্ব্যবহার করা চাই। সদ্ব্যবহারের পাত্র সম্বন্ধেও পুলিনের কিছু ভাবিবার দরকার করিল না।

পুলিস কোর্টের নুটু উকীল নূতন গাড়ী করিয়াছে এবং কথা কহিতে গেলেই আত্ম-মর্য্যাদায় অত্যধিক ঝোঁক দিয়া ফেলে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন কোর্টের মধ্যেই তাহাকে কি বলিয়াছেন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর যে তাহাকে পার্টনার না পাইলে ব্রিজের টেবিলে বসিতে চাহেন না, এসকল খবর যে কোনও কথার ভিতর সে আপনাকে শুনাইয়া দিবেই। সুতরাং পুলিন ডাক্তারের মতে নুটু উকীলকে না ঠকাইলে পয়লা এপ্রিলের কোনও অর্থই হয় না। সিধুর ও আমার আপত্তি নাই।

কিন্তু অবিনাশের আছে। তাহার আপত্তি নুটুর প্রতি স্নেহ-প্রসূত নহে। পরিহাস মাত্রেই তাহার আপত্তি। তাহার উপর আবার জামাইকে জুতা কিনিয়া দিতে হইতেছে। সে তাহার উদ্ভট থিওরি, পরিহাসের দামের কথা পাড়িল।

অবিনাশের বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা শুনিলে মরা মানুষের রাগ হয় তা পুলিন

ডাক্তার তো জীবন্ত লোক। ডাক্তার জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পুলিন যতই রাগে চঞ্চল হয়, অবিনাশ ততই ধীরভাবে পরম নির্লিপ্ত উদাসীন স্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার cynicismএর বাণী আওড়াইতে থাকে। ফল এই হইল যে, যদিই বা এমনিতে নুটু উকীলের পয়লা এপ্রিল—কৃত্য সম্পন্ন করা নাও হইত, অবিনাশের বিজ্ঞতার চাবুকে পুলিনের দুষ্টবুদ্ধির অশ্ব চার পা তুলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল ছুটিবার জন্য। অনেক মতলব ভাঁজা হইল এবং অনেক মতলব বাতিল হইল। অবশেষে বহু গবেষণার পর যে মতলব খাড়া হইল সেটা যে নুটু উকীলের অমোঘ মৃত্যুবান হইবে, তাহা ভাবিয়া আমাদের মন অতি নিঃস্বার্থ বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল। সব দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল শিকারের পলাইবার ফাঁক কোথাও নাই এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে যে জালের পাকে পাকে নিজেকে জড়াইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিল না।

আমরা বন্ধুবর নুটুর সেই চরম মুহূর্ত্তের ছবি মানস নেত্রে দেখিয়া পরম উৎসাহের সহিত এই মতলবকে কার্য্যকরী করিবার উপায় উদ্ভাবনে মন নিবিষ্ট করিলাম।

দেখা গেল এই মতলব মতো কাজ শুরু করিতে গেলে কেবল একটি যন্ত্র আমাদের জোগাড় করিতে হইবে। সেই যন্ত্র একজন সদাশয় সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক। এই মনুষ্যযন্ত্রের সাহায্যেই আমরা প্রথমে নুটু উকীলের সন্দেহের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিব। তারপর সেই ভদ্রলোকের ছুটি এবং আমাদের কার্য্যারম্ভ।

"সৌম্যমূর্ত্তি" কথাটা বোধহয় পুলিনই বলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ও সিধুর মুখ দিয়া সমস্বরে বাহির হইল—"ঠিক আমাদের মাষ্টার ম'শায়ের মতো।"

এই কথা বলার পরক্ষণেই এক নাটকীয় যোগাযোগ ঘটিল। মাষ্টার মহাশয়ের আবক্ষ শাদা দাড়ী ও স্বাভাবিক প্রশান্তি-ভরা মুখখানি পথের উপর দেখা গেল। পুলিন আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ যে মাষ্টার মশাই। বাঃ বাঃ! এ নিশ্চয় শ্রীভগবানের একান্ত ইচ্ছে যে স্নুটুর ঘাড়টা কাল আমাদের দিয়েই মটকাবেন। সবই তাঁর কৃপা!"

ইচ্ছা করিলে ও সুযোগ বুঝিলে পুলিন ডাক্তার ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া উঠে। তাহার কথিত ভগবান সত্যই স্নুটুর বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছেন মনে হইল। কারণ মাষ্টার মহাশয় কেবল মাত্র জানালার বাহিরে দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। পরমুহূর্ত্তেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

দেখিয়া পুলিনের ভক্তির সীমা রহিল না। গদগদ কণ্ঠে বলিল—"মাষ্টার মশাই, আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি।"

মাষ্টার মহাশয় হাসিমুখে বলিলেন—"নিশ্চয়, তাতে আর সন্দেহ আছে? ঈশ্বর না প্রেরণ করলে আর এলুম কী করে? শুধু ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিই নই, ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তিও বটে। কারণ ঈশ্বরের অজানা আর কী আছে বল?"

ঈশ্বরতত্ত্ব শুনিতে সিধুর ভাল লাগে না। সে কহিল—"যাক্‌গে, ঈশ্বরের কথা থাক্ মাষ্টার মশাই, আমাদের কথাটা আপনাকে বলি। অবিনাশ, মাষ্টার ম'শায়ের চা-টা আনতে বলে দাও হে।"

অবিনাশ চা ইত্যাদি সরবরাহ করিতে কখনই কাতর নয়। কিন্তু সিধুর কর্ত্তৃত্ব তাহার সহ্য হয় না। সে রাগ করিয়া বলিল "কেন, তুমি বলতে পার না? ইয়ার্কি ম্যারবেন ওঁরা, আর হুকুম করবেন আমার ওপর। আমি পারব না যাও। পার তো নিজে বলগে।"

সিধুর সব বাড়ীতেই অবারিত দ্বার। তাহার কারণ দ্বার বারিত

হইলেও সে তাহা মানে না। সে উঠিয়া গিয়া অবিনাশের স্ত্রীকে জানাইয়া আসিল মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন। ঐ জানানোটাই শুধু প্রয়োজন।

মাষ্টার মহাশয় ছেলে বুড়া সকলেরই মাষ্টার মহাশয়। কয়েক বৎসর হইল এই পাড়ায় বসতি করিয়াছেন। সবারই সুখ ও দুঃখে তাঁহার ভাগ আছে। আলো ও হাওয়ার মত তিনি সহজ ও সুপ্রাপ্য এবং সকলেরই নিজস্ব।

লাঠিটি দেয়ালের কোণে রাখিয়া, জুতা খুলিয়া, মাষ্টার মহাশয় তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিলেন—"তারপর? ঈশ্বর আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁর এ দূতকে তোমাদের কাছে কেন প্রেরণ করলেন শুনি?"

পুলিন বলিল—"আপনাকে একটি কাজ করতে হবে মাষ্টার ম'শাই, বুঝেছেন?"

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—"এ বোঝা তো খুব শক্ত নয় বাবা, কিন্তু কাজ করতে হবে বলছ, তাইতো! ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ—সিধু রাগ করো না বাবা, ঈশ্বরের কথা বলছি না, আমার কথা বলছি—ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করেছেন বটে কিন্তু কাজের লোক করে প্রেরণ করেন নি।"

পুলিন বলিল—"না না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমরাই করব, আপনি শুধু বসে বসে, বুঝেছেন—"

মাষ্টার মহাশয় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া কহিলেন "বুঝেছি তাহলে আমি খুব পারব। যে কাজে আমাকে কিছু করতে হবে না, সে কাজ যত শক্তই হোক, আমি খুব পারব। আর বসে বসে? সে তুমি দেখে নিও, বসে বসে হাত-পা না নেড়ে করবার যত কাজ আছে সব তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আমার নামে লিখে রাখো।"

অতঃপর মাষ্টার মহাশয়ের সকাশে ষড়যন্ত্র পেশ করা হইল। তিনি

তাঁহার সহজ হাসিমাথা মুখে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া শুনিতে লাগিলেন। আর এক ব্যক্তি নীরবে শুনিল, সে অবিনাশ। আমরা মাষ্টার মহাশয়ের মাথা নাড়ার ও হাসি মুখের সমর্থন পাইয়া উৎসাহিত হইতেছি দেখিয়াও অবিনাশ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিল।

মাষ্টার মহাশয়ের চুল শাদা হইয়াছে, দাড়ি শাদা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চোখ এখনও কালো আছে, তাহাতে ঘোলারঙের আমেজ লাগে নাই। দলের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াও অবিনাশ যে এত গম্ভীর ও নীরব রহিয়াছে ইহা তাঁহার চোখ এড়াইল না। তিনি অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কী বল ?"

প্রগাঢ় বৈরাগ্য ও অবহেলাভরে অবিনাশ উত্তর দিল—"আমার বলা বলিতে কী আসে যায় বলুন? আমি আবার একটা লোক, আমার আবার কথা, হুঁঃ ?" বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া দেয়ালে লম্বিত ক্যালেণ্ডার পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

একচল্লিশ বৎসর বয়সের অবিনাশের অভিমান হইয়াছে, তাহা মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন—"তবু ?"

অবিনাশ মুখ ফিরাইল না। সে ক্যালেণ্ডার পড়িতে পড়িতে বলিল —"না, আমি কিচ্ছু বল্‌ব না।" এবং মাষ্টার মহাশয় দ্বিতীয় অনুরোধ করিবার আগেই কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া বলিল—"না মাষ্টার মশাই, আপনি আমাকে মাপ করবেন, আমি এতে একটি কথাও কইতে চাই না।" সে আরও একটু ঘুরিয়া বসিয়া ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলি বোধহয় ঠিক দিতে লাগিল।

সিধু বলিল—"আঃ, ওর কথা ছেড়ে দিন মাষ্টার মশাই। ও আবার কী বলবে ?"

অবিনাশ ক্যালেণ্ডার ছাড়িয়া ঘুরিয়া সোজা হইয়া বসিল ও প্রবল কণ্ঠে বলিল—“কেন বলব না? আলবৎ বলব। তাহলে বলি শুনুন মাষ্টার মশাই।”

মাষ্টার মহাশয় খুশী হইলেন যে অবিনাশ কিছু বলিবে। বলিলেন—“বল বাবা।”

সিধু তক্তাপোষের উপর চড় মারিয়া বলিল—“আহা হাঁ, ওর কথা শুনতে হবে না আপনাকে, আমি বলি শুনুন—”

মাষ্টার মহাশয় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি ফিরাইয়া সিধুর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া কহিলেন—“হ্যাঁ, বল।” তারপর পুলিন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“তোমরাও বল বাবা, আমি শুনছি।”

এই জন্যই মাষ্টার মহাশয় সর্ব্বজনপ্রিয়। সকলের কথাই তিনি শুনিতে প্রস্তুত ও শুনিয়াও থাকেন। সবাই যদি একই সঙ্গে শুনাইতে চাহে, তাহাতেও তিনি আপত্তি করেন না। যদিচ সকলের কথা একই সঙ্গে শুনিতে গেলে কাহারও কথাই শোনা যায় না, তথাপি যাহারা না শুনাইয়া ছাড়িবে না, তাহারা তো খুশী হয়।

সুতরাং অবিনাশ শুরু করিল তাহার পরিহাসান্তিক মতবাদ এবং আমরা যুগপৎ মাষ্টার মহাশয়কে উপলক্ষ্য ও অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া প্রবল তর্ক করিলাম। এই গোলযোগের মধ্যে বসিয়া মাষ্টার মহাশয় তাঁহার মৃদুহাসি ও গভীর মনোযোগ সহকারে ক্রমান্বয়ে সামনে, পিছনে, এ-পাশে, ও-পাশে চাহিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় বলিয়াই আমাদের কলরব কিছু পরে থামিয়া আসিল। তখন মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—“অবিনাশ, রাগ করো না, তোমারই ভুল। তোমার কথা মানতে গেলে তো লোকের

ঠাট্টা তামাসা করা ছেড়ে দিতে হয়। তা হলে সংসারে বাঁচা দায় হবে যে বাবা।"

আমরা জিতিলাম। জয়লাভের আনন্দে সিধু অবিনাশের ম্রিয়মাণ মুখের দিকে চাহিয়া তক্তাপোষে চড় মারিয়া বলিল—"য়্যায়।"

মাষ্টার মহাশয় তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আর সিধু, তোমরা অবিনাশের কথাটি মেনে না নিয়ে ভুল করছ। ওর কথাটি বড় খাঁটি কথা।"

সিধু তক্তায় আর একটি চড় মারিবার জন্য হাত তুলিয়াছিল। হাত উদ্যতই রহিল, মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"চাঁটি মেরে তর্ক করে উড়িয়ে দেবার কথা ওটি নয়। দাম না দিয়ে কক্ষণো কিছুই পাওয়া যায় না, ইহজগতেই বল, আর পরজগতেই বল।"

অবিনাশের মুখ উজ্জ্বল হইল। সিধু এক পলক সেই দিকে চাহিয়া বলিল—"তাহলে কি আপনার যুক্তি হচ্ছে যে—"

অবিনাশের চাকর চা লইয়া আসিল। হাত বাড়াইয়া চায়ের বাটী লইয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"পাগল না কি? আমার আবার যুক্তি কিসের? সে ভয় কোরো না, যুক্তিটুক্তি আমার নেই বাবা। তবে একটা গল্প মনে পড়ল, যদি শোনো তো বলি।"

পুলিন ডাক্তার গল্পের পোকা। তাকিয়া ঠেস দিতে দিতে কখন সে শুইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "আলবাৎ। যদি শোনো আবার কি?" ভালো করিয়া গল্প শুনিবার আগ্রহে সে তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।

ভালো করিয়া গল্প উপভোগ করিবার জন্য অবিনাশ তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—"বলুন।"

আড্ডা জমাইবার পক্ষে মাষ্টার মহাশয়ের গল্পের মতো দাওয়াই আর নাই। আমি অবহিত হইয়া বসিলাম। সিধুও মাষ্টার মহাশয়ের গল্পের

কম ভক্ত নয়। কিন্তু তর্কের জের টানিয়া বলিল—"গল্পই বলুন আর যাই বলুন, অবিনাশের কথা তা বলে' আমি মানতে পারব না, মরে গেলেও—"

গল্প শুনিতে বসিয়া কোনও বিলম্ব, কোনও বাধা পুলিন ডাক্তার সহ্য করিতে পারে না। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"মরগে না বাইরে গিয়ে। এখানে যদি ফের বক্ বক্ করবি তো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবো, হ্যাঁ।"

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়া মাষ্টার মহাশয় গল্প শুরু করিলেন।

"গল্প বলছি বটে, কিন্তু বানিয়ে বলছি না। আমার নিজেরই কথা। বল্লে তোমরা হয় তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু একদিন আমার এমন দিন ছিল যখন এই যে এতবড় শাদা দাড়ী, এই আমার সাইনবোর্ডটি, এটি ছিল না। এমন কি তখন দাড়ীই ছিল না। মনে করছ অহঙ্কার করছি, কিন্তু সত্যি। সেইকালের কথা।

বছর পাঁচেক হল চাকরিতে ঢুকেছি, একটা মস্ত বড় "এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড-এ।"

সিধু বলিল—"পাঁচ বছর চাকরি করেন, অথচ দাড়ী নেই?"

মাষ্টার মহাশয় জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবিনাশ তাড়াতাড়ি তাকিয়াতে বাঁ হাতের কনুয়ের ভর দিয়া উঁচু হইয়া ডান হাত তুলিয়া বলিল—"আপনি থামুন মাষ্টার মশাই, আমি ওর জবাব দিচ্ছি।" পরে সিধুকে বলিল—"দাড়ী না থাকলে চাকরী করা যায় না? তোমাদের বাড়ীর ঝিয়ের দাড়ী আছে তো? ষ্টুপিড্!" সে তাকিয়ার উপর দেহভার ঢালিয়া দিল।

সিধু বলিল—"বুদ্ধির ঢেঁকি! যা বোঝো না, তাতে কথা কইতে যাও কেন? বলছি পাঁচ বছর চাকরি হল, তখনও দাড়ী হয় নি? এত ছোট বয়েসে চাকরিতে ঢুকেছিলেন?"

এবার মাষ্টার মহাশয় জবাব দিলেন—"হয় নি তো বলিনি বাবা, ছিল না বলিছি। কামাতুম কি না তখন।"

অবিনাশ বলিল—"হল? বুদ্ধিমান?"

পুলিন আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, বলিল—"অবিনাশ, সিধে, আর একটি কথা যদি কয়েছ, দু'জনের মাথায় ঠোকাঠুকি করে মাথা ফাটিয়ে তবে ছাড়ব, মনে থাকে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"যাক্, যা বলছিলুম। মার্চেন্ট অফিসে কাজ করি, অথচ এমনি অদৃষ্ট যে সবার সঙ্গেই ভাব, সবাই স্নেহ করে। সেদিন অফিসে গিয়ে বসে সবে দুর্গানামটি শেষ করেছি, বেয়ারা একটা সার্কুলার নিয়ে এল। কী? না, একজন পুরোনো পার্টনার, অনেক দিন হল রিটায়ার করে দেশে বাস করছিলেন, তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাই তাঁর স্মৃতির সম্মানে অফিস এগোরোটার সময় বন্ধ হবে। মনটা কী রকম খুশী হল তা বুঝতেই পারছ। ভদ্রলোক নিজের প্রাণ দিয়েও যে আমাদের উপকার করে গেলেন, তার জন্যে তাঁকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ না করে পারলুম না। চেয়ে দেখি আশে পাশের সকলেরই হাসিমুখ। সুরেশ্বর নামে একটি ছোকরা আমার পাশেই বসত। অল্পতেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। বল্লুম, সুরেশ্বর, একটা লিষ্ট করে দিতে পার, আর কতগুলি পুরোনো পার্টনার জিয়নো আছে? তাহলে বোঝা যায় হরির ইচ্ছেয় আর কটা ছুটি পাওনা আছে।

স্থরেশ্বর অত্যন্ত হাসতে লাগ্‌ল। বল্লে, আর ভাই, আগে এই ছুটিটাই ভোগ কর, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভেবো। বলে' আরও হাসতে লাগল।

পার্টনার জিইয়ে রাখা কথাটা, মিছে কথা বলব না, একটু রসিকতা করেই বলেছিলুম। কিন্তু স্থরেশ্বর এত বেশী হাসবে তা আশা করি নি। রসিকতা সফল হলে মন যে অতিশয় খুশী হয়, তা বলা বাহুল্য। বল্লুম— আরে এ ছুটি তো মিলেই গেছে। এ আর ভোগ করা করি কী? ক'ঘণ্টারই বা ছুটি, খালি ছুটোছুটিই সার। ভবিষ্যতের ভাবনাটাও তো ভাবতে হবে।

—যা বলেছ দাদা, ছুটি তো নয়, ছুটোছুটিই সার। স্থরেশ্বরের হাসি উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল। তখন তো বুঝি নি কত বড় সত্যি কথা বলেছি। ছুটোছুটির রসিকতাও সফল হল দেখে আরও আনন্দিত হলুম।

ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু মুখখানিকে অতি প্রশান্ত ও গম্ভীর করে আমার টেবিলের ধারে এগিয়ে এলেন। টেবিলের ওপর থেকে আমার পালকটি, মানে আমার পায়রার পালকটি তুলে নিয়ে বল্লেন,—কী হে স্থরেশ্বর, এত হাসির ঘটা কেন? কাজ-কর্ম কিছু নেই বুঝি হাতে? মাষ্টারও যে—আ-া-াঃ। পালক তখন তাঁর কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়ে চোখ ছু'টি বুজিয়ে দিয়েছে।

বড়বাবু হলেও লোকটি ভদ্রলোক ছিলেন। অবাধে কথাবার্ত্তা কইতুম আমরা। বল্লুম,—আজ আর কাজ-কর্মের কথা কেন বড়বাবু? এই তো সাড়ে দশটা বাজে, এগারোটায় পিট্‌টান। আমি তো বাবা আজ খাতা-পত্তর খুলছি না।

বড়বাবু ঈষৎ হেসে বল্লেন—না খুলতে পারলেই ভালো।

যেমন বাঁধা মাইনের চেয়ে উপরি টাকাটা-সিকেটা বেশী প্রীতিকর,

তেমনি ক্যালেণ্ডারের বাঁধা ছুটির চেয়ে উপরি ছুটিতে আহ্লাদ বেশী হয় তা বোধ হয় জানো ? এরকম একটা উপরি ছুটি বাড়ীতে পড়ে পড়ে গড়িয়ে নষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। ঠিক করলুম মাছ ধরতে যাব, আমার এক জানা পুকুর আছে, সেইখানে। সুরেশ্বর বল্লে, সেও যাবে। দুজনে বসে বসে মাছ ধরার প্ল্যান করতে লেগে গেলুম। সুরেশ্বর কারণে অকারণে কথায় কথায় হাসতে লাগল।

পৌনে এগারোটায় কলম-টলম তুলে রেডি। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে উঠে পড়লুম। কে একজন বল্লে, এখনো পাঁচ মিনিট আছে যে হে।

—থাকুক, ওটা তোমাকে দান করলুম। বলে, বড়বাবুর কাছে গিয়ে উপদেশ দিলুম, আর কেন সার, দোকান-পাট তুলুন না। বড়বাবু বল্লেন —এই যে ভাই, হয়ে গেছে। তোমরা এগোও।

এগোলুম। পেছনে আসতে আসতে সুরেশ্বর কী যেন বল্লে। সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। বুঝলুম হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ছুটিটা পেয়ে শুধু সুরেশ্বরের নয়, সকলেরই হাসি রোগ ধরেছে।

এগারোটা বাজতে এক মিনিটে ট্রাম এলো। উঠে বসলুম। এগারোটা বাজতে পৌনে এক মিনিটে ট্রাম ছাড়লো ও সুরেশ্বর উঠল। আমার পাশে বসে সুরেশ্বর কথা কইলে। আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলুম। এগারোটায় সুরেশ্বর আর আমি ট্রাম থেকে নামলুম। এগারোটা বেজে তিন মিনিটে আমি কাঁদ কাঁদ মুখে, আর সুরেশ্বর হাসি-মুখে অফিসে ফিরে এসে নিজ নিজ চেয়ারে বসলুম। সুরেশ্বরের হাসিতে সকলেই যোগ দিল। আমি ঘাড় হেঁট করে টেবিলের ওপর চেয়ে রইলুম। টেবিলের ওপর আবার সেই সার্কুলার। এবারে তারিখটার নীচে লাল-কালির দাগ টানা। তারিখটা পয়লা এপ্রিল।

বড়বাবু ডেকে বল্লেন,—কী হে মাষ্টার, চার গুলিয়ে গেল না কি? কী মাছ ধরলে? রাঘব বোয়াল? বড়বাবুর গাম্ভীর্য্যের মুখোস এতক্ষণে খস্‌ল। তাঁর প্রবল হাসির সঙ্গে তখন আমার হাসিও মিশ্‌ল।

বাস্তবিকই তারিফ করতে হয়। শুনলুম বুদ্ধিটা বড়বাবুরই, হাতের কাজটা সুরেশ্বরের। সার্কুলারের তলায় বড়সাহেবের সইটি যা করেছিল, সে দেখলে বড়সাহেবেরও হিংসে হতো। ভারি আনন্দ হল। প্রচুর হাসতে হাসতে ও অতি দুঃখের সঙ্গে খাতাপত্তর খুললুম। এই গেল প্রথম পর্ব্ব।

বেলা যখন সাড়ে বারোটা, তখন ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা এসে জানালে আমাকে কে টেলিফোনে ডাক্‌ছে। বললুম, যা যা, নিতাইবাবুকে বলগে যা ওতে চলবে না, আরও কিছু বুদ্ধি থাকে তো বার করতে বল্‌।

ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের নিতাই একটি ফাজিল ছোকরা। খানিকক্ষণ আগেই ঐ রকম টেলিফোনের ডাক পাঠিয়েছিল এক বাবুর জন্যে। সে বেচারা টেলিফোনের কথা আর শোনেনি, গিয়ে খালি নিতাইয়ের হাসি শুনে ফিরে এসেছে।

বেয়ারা আবার এলো। বল্লে ক্যাশিয়ারবাবু ডাকছেন। ক্যাশিয়ার-বাবু প্রবীণ লোক, আমার ঠাট্টার যোগ্য নন, মানে আমি তাঁর ঠাট্টার যোগ্য নই। গেলুম। ক্যাশিয়ারবাবু বল্লেন,—না হে, মিথ্যে নয়, সত্যি কল্‌। লালবাজার পুলিশ অফিস থেকে তোমার নাম করে খুঁজছে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জরুরী। বলে' টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে দিলেন।

জরুরী নয়, ভীষণ খবর। একটা বেয়াড়া মোটা গলায় কট্‌কটে ইংরিজিতে রিসিভারটা কথা কইলে। নাম বল্লে—সার্জ্জেণ্ট এণ্ডারসন্‌, লালবাজার এমার্জেন্সি অফিস। খবর বল্লে,—একটি বাঙ্গালী যুবক ঘণ্টা

খানেক আগে লালবাজারের সামনে মোটর চাপা পড়েছে। এখনও জ্ঞান হয় নি। অবস্থা সঙ্গীন। লোকটির পরিচয় কিছু জানা যায় নি।

বল্লুম,—খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাকে এ খবর দেবার উদ্দেশ্য কি? আর আমার নাম ঠিকানাই বা পেলে কোথা?

সার্জেণ্ট এণ্ডারসনের জালার মতো গলা আমাকে ধমক দিলে,—সেই কথাই তো বলা হচ্ছে, কথায় বাধা দিও না। সেই হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেছে, তাতে তোমার নাম ও অফিস লেখা রয়েছে।

আমি বিস্ময়ে ও ধমকের ভয়ে অবাক হয়ে রইলুম, ভাবতে লাগলুম, কে এমন লোক যে আমার নাম ঠিকানা লিখে লালবাজারের পথ দিয়ে মোটরযোগে পরলোকযাত্রা করলে। সার্জেণ্ট তখন লোকটার বর্ণনা বলে' যাচ্ছে। সব বাঙ্গালী যুবকই টেনিস সার্ট পরে কিম্বা পরতে পারে। চশমা, ছাতা, রিষ্টওয়াচ এবং পাঁচ ফিট ছ' ইঞ্চি, কিছুই কারও সঙ্গে মেলে না, অথবা সবার সঙ্গেই মিলে যায়। আমি সব কথা শুনছিই না। হঠাৎ কানে এলো,—আর তার হাতে একটা নীল কাগজে ছাপা বাড়ীর নক্সা, গোল করে পাকানো।

শুনেই মাথা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলুম—ব্লু প্রিণ্ট? তার নীচে কি এই কথা লেখা আছে?"

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে এণ্ডারসনের জবাব পেলুম—রাইট্ ও।

আবার জিজ্ঞেসা করলুম—যে কাগজে আমার নাম লেখা আছে তার উল্টো পিঠে কি একটা রাস্তার নক্সার মতো আঁকা আছে?

সার্জ্জেণ্ট খুশী হয়ে বল্লে—ঠিক তাই। তাহলে তুমি এই যুবককে চিনতে পেরেছ? এর বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া দরকার, এতক্ষণ এর

পরিচয় জানা না থাকাতে কিছু করতে পারা যায় নি। বাবু, তুমি একবার দয়া করে আসতে পারবে কি ?

দয়া টয়া নয়, যেতে হবে বলেই যেতে হবে। কর্ত্তব্য, অপ্রিয় হলেও আমার ঘাড়েই এসে পড়ল যখন, তখন আর উপায় কী ? বড়বাবুকে সব বলে ছুটি নিয়ে ছুটলুম।

আহা, বিধবার একমাত্র ছেলে এই আনন্দ। বছর ঘোরেনি, বিয়ে করেছে। অতি ফুর্ত্তিবাজ ছেলে। জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ, যাহোক করে একখানি মাথা গোঁজার মতো বাড়ী তুলবে। আজই সকালে ঐ প্ল্যান নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। কত পরামর্শ করলে, কত জল্পনা কল্পনা। আহা! সব বুঝি শেষ হয়ে গেল! আমার জানা একজন কনট্রাক্টারের বাড়ীর ডিরেকসন্ (নিশানা) কাগজে এঁকে নিয়ে গেল। আমার নাম করে দেখা করবে বলে আমারও নাম, আপিসের ঠিকানা লিখে নিলে। যেন চোখের ওপর ভাসছিল আনন্দর চেহারা। হাসি মুখ, ডান হাতে নীল নক্সাটা পাকানো, বাঁ হাতে কোঁচা। কোথায় রইল তার বাড়ী, আর কোথায় রইল তার প্ল্যান। এমনি করেই মানুষের সব প্ল্যান ভেস্তে যায়। কিন্তু আমি এখন তার বুড়ী মাকেই বা বলি কী, আর তার কচি বৌটাকেই বা কী খবর দেব ? বৌয়ের কথা বলতে অজ্ঞান ছিল।

মানব জীবনের নশ্বরতার কথা ভাবতে ভাবতে হন্‌হন্ করে চলেছি। চোত-বোশেখের রদ্দুর আর নিদারুণ দুশ্চিন্তায় মাথা যেন ঘুরছে। লালবাজারে গিয়ে আর এক বিপদ। ও-রাজ্যে তো কখনো পদার্পণ করি নি। ঘুরে ঘুরে হয়রান, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্ট আর খুঁজে পাই না। যাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ বলতে পারে না। বরং যেন পাগল মনে করে হেসে উড়িয়ে দেয়।

তিনবার ক'রে সমস্ত কম্পাউণ্ড, বাড়ী ঘুরে এসে লালবাজার হেড কোয়াটার্সের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এণ্ডারসন ব্যাটার কথা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারিনি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কী বলেছে সে, আর কী শুনেছি আমি। এখন কোন দিকে যাই। আনন্দ বোধহয় আর টিকে নেই। কিন্তু তার দেহটার তো গতি করতে হবে। এতক্ষণে দেহটাকে মর্গেই পাঠিয়ে দিলে কিনা কে জানে। কবে যে ছাড়বে, আর কবে যে গতি হবে!

গতি আর আমাকে করতে হল না। দেখি দেহের গতি দেহ নিজেই করছে। রাস্তার ওপার থেকে আনন্দর দেহ এসে হাজির হল। সেই পাকানো নীল নক্সার কাগজ হাতে রয়েছে তখনও। দেখে বুকের মধ্যে যে কী করে উঠ্‌ল তা বলে বোঝাতে পারিনা।

হাঁ করে চেয়ে রইলুম। আনন্দ বল্লে,—কী—মাষ্টার যে, কতক্ষণ? আরে—মুখে কথা নেই, হাঁ করে দেখছ কী? ভূত দেখেছ না কি?

বল্লুম,—তুমি আছ? আনন্দ বল্লে,—আছি বলে আছি। দিব্যি জলজ্যান্ত আছি। তুমি কি ভাবছ যে আমি গাড়ী চাপা পড়েছি?

বোকার মত বল্লুম,—পড়োনি? তবে কে গাড়ী চাপা পড়ল? এমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্ট···

পাপিষ্ঠ আনন্দ সার্জেণ্ট এণ্ডারসনের ভাষায় ও গলায় বল্লে,—ভেরি সরি, বাবু, এমারর্জেন্সি ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ হয়ে গেছে, আর সার্জেণ্ট এণ্ডারসন পয়লা এপ্রিল থেকে পেন্সন নিয়েছে, না হলে তোমাকে সব খবর দিতে পারতুম। সে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। আমি রাগ করতে গিয়েও রাগতে পারলুম না। তার মাকে আর বৌকে দুঃসংবাদ দেওয়ার হাত থেকে যে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এর জন্যেই তাকে আশীর্ব্বাদ করলুম।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল দুপুর রোদে এই দুর্ভাবনায় আর দুর্ভোগে। ঘোলের সরবৎ খাইয়ে,পান খাইয়ে আনন্দ আমাকে ঠাণ্ডা করলে। এতক্ষণে তার পেজোমোর কথা ভেবে আমার হাসি এল। পাপিষ্ঠ এই মতলব করেই আজ প্ল্যানটা হাতে ক'রে আমার বাড়ী গিয়েছিল, এই মতলব ক'রেই একটা কাগজে আমার নামধাম লিখেছিল। ছাতা হাতে বাঙ্গালী যুবক বা চশমা-পরা বাঙ্গালী যুবক হাজার হাজার আছে, কিন্তু পাকানো নীল প্ল্যান হাতে বল্লে আজ আমার ওর কথাই মনে পড়বে। সখের থিয়েটারে অভিনয় করতো, টেলিফোনে সাহেবের গলা নকল করতে তার কিছুই অসুবিধে হয়নি। টেলিফোন ক'রে দিয়েই দেখতে এসেছে লালবাজারে আমার অবস্থাটা। এমন প্রাণান্ত ঠাট্টাও লোকে করে ?

হাসতে হাসতে এবং তাকে গালাগাল দিতে দিতে অফিসে ফিরে এলুম। বাবুরা সাগ্রহে ও সহানুভূতিতে গদগদ হয়ে ছুটে এল এবং আনন্দ-সংবাদ শুনে হেসে লুটিয়ে পড়ল।”

আমরাও আনন্দ-সংবাদে হাসিতে লাগিলাম। অবিনাশ হাসি চাপিবার উদ্দেশ্যে ক্যালেণ্ডার পড়িবার চেষ্টা করিল।

অবিনাশের চাকর আসিয়া একটা কাঁসার থালা হইতে এক একটা কলাই-করা বাটি নামাইয়া দিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয়ের সৎসঙ্গে আমাদেরও উপরি পাওনা হইত।

সিধু বলিল—“ওয়াণ্ডারফুল! আপনার আনন্দবাবুর ঠিকানাটা দিতে হবে মাষ্টার মশাই। তাঁর কাছ থেকে অনেক জিনিষ পাওয়া যাবে। জিনিয়াস!”

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—“সে এখন কোথায় আছে তা তো জানি

না। মাঝে শুনেছিলুম আনন্দ মীরাটে না মাদুরায় কোথায় বদলি হয়েছে। তবে খবর পেলে তোমাকে জানাব।"

অবিনাশ বলিল—"আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনার একবার খেয়াল হলনা যে, গাড়ী চাপা-পড়া লোককে লালবাজারে কেন ফেলে রাখবে? তাকে নিশ্চয় মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেবে যদি বাঁচাতে পারে। আর এমার্জেন্সি ডিপার্ট তো হাসপাতালেই থাকে।"

মাষ্টার মহাশয় চায়ের বাটি হইতে প্রসন্ন বদন তুলিয়া কহিলেন—"তা আর খেয়াল হয়নি? অনেকবার হয়েছে। ঠিক এই কথাই আমি কত বার ভেবেছি। কিন্তু সে লালবাজার থেকে ফেরবার পর। প্রথম যখন আনন্দ অর্থাৎ এণ্ডারসন্ সার্জ্জেণ্ট টেলিফোনে দুর্ঘটনার খবর দিলে, তখন ও খেয়ালটি হয়নি বাবা।"

পুলিন জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু অবিনাশের দামের থিওরি সত্যি হল কিসে? পয়লা এপ্রিল তো সেবার আপনার চূড়ান্ত হ'ল, কিন্তু—"

মাষ্টার মহাশয় চায়ের বাটি তক্তাপোষের নীচে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—"চূড়ান্ত তখনও হয়নি। জানো তো আমাদের বাঙ্গলা শাস্ত্রে বলে বার বার তিন বার?"

বলিলাম—"আরও আছে?"

"আছে বই কি।"

পুলিন খুশী হইয়া বলিল—"সেই দিনেই?"

—"হুঁ, সেই দিনেই তো। তা নইলে আর এ গল্প বলব কেন?"

সিধু বলিল—"বাঃ বাঃ, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মাষ্টার মশাই, আপনাকে হিংসে হচ্ছে।"

প্রচণ্ড ধমক দিয়া পুলিন সিধুকে থামাইয়া দিল এবং অবিনাশ

তাকিয়া বুকের তলায় লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া ডাকিল—"মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"এই যে বলি বাবা। তুমি কান খাড়া ক'রে শুয়েছ, তা দেখেছি অবিনাশ। কিন্তু এবার আর কিছু চালাকি করতে পারেনি।"

লালবাজার থেকে ফিরে সবে কাগজ পত্তরে মন দিয়েছি, আবার ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের দূত এলো—টেলিফোনে আমাকে ডাকছে। বলে দিলুম, যাবনা, যাঃ। বড়বাবু শুনতে পেয়ে বল্লেন, মাষ্টার কি ভয় পেলে নাকি? —সত্যি ডাকও তো হতে পারে, যাও না।

বল্লুম,—দু'বছরে একটা টেলিফোন আসে না আমার, আর আজ ডাকের ওপর ডাক। ক্ষেপেছেন আপনি? এ আপনার পয়লা এপ্রিলের মাহাত্ম্য। নেড়া বেলতলায় দু'বারই যায় না বড়বাবু, তিনবার তো নয়ই।

বেয়ারা ফিরে গেল। ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের এক বাবু এসে বল্লেন,—কী আপনার রকম বলুন তো? টেলিফোনটা সেই থেকে আটকে আছে, একবার শুনলেই কি ঠকে যাবেন?

ভাবলুম, তা বটে। এবারে আর ঠকছি না। তবে কোন্ মহাত্মা দেখতে ক্ষতি কি। ফাঁদে পা না দিলেই হ'ল। গেলুম এবং টেলিফোনও ধরলুম। টেলিফোনের স্বর প্রকৃত স্বর থেকে তফাৎ হয়ই। ঠিক না মিললেও সুধীরচন্দ্রের সুকণ্ঠ চেনা অসম্ভব হল না। সুধীর ছিল আমার আর একটি মহারসিক বন্ধু।

দু'চার কথা শুনেই আমার সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না, বিশ্বাসে দাঁড়াল। সুধীরচন্দ্রের সামান্য তোতলামিটাই তাকে ধরিয়ে দিলে।

কিন্তু কিছু জানতে দিলুম না যে আমি ধরে ফেলেছি। সমস্ত খবরটি তার বলা হলে রিসিভারের চোঙের ভেতর মোটা গলায় বল্লুম,—যে আজ্ঞে, অমুকবাবু এলেই আমি তক্ষুণি জানিয়ে দোব। সে কি কথা! এত বড় জরুরি খবর! তাঁর পটলডাঙ্গার বাসায় তো? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি এলেই তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। না, না, এ কি ভুলে যাবার কথা? আচ্ছা, নমস্কার।

তারপর রিসিভার নামিয়ে যথাস্থানে রেখে এক থেকে কুড়ি পর্য্যন্ত গুণলুম। গণনার পর রিসিভার তুলে নিয়ে সুধীরের অফিস ডাকলুম। সুধীরকে পেলুম। সুধীর বল্লে,—কে? বল্লুম, কে তাও বলতে হবে? কিন্তু একটা যে গোড়ায় গলদ করে ফেলেছ ভাই। আমার ছেলেটা যে দিন দুই আগে তার মামার বাড়ী গেছে, তা বোধহয় তোমার জানা ছিল না, না?

টেলিফোন তো টেলিভিসন নয়। দেখতে পেলুম না, ধরা পড়ে গিয়ে বন্ধুর মুখখানি কেমন উজ্জ্বল হল। তবু ভাঙ্গে তো মচ্‌কায় না। সুধীর বল্লে,—কে বল তো? অমুক কি?

বল্লুম,—তবু ভালো যে চিনতে পেরেছ।

সুধীর বিস্ময়ের সুরে বল্লে,—কী বল্লে বল তো? তোমার ছেলের কী হয়েছে?

বল্লুম, আহা, তোমার স্মৃতি শক্তি এত খারাপ হয়ে গেল। এই যে পাঁচ মিনিটও হয়নি তুমি আমাকে খবর দিলে আমার ছেলে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ভুলে গেলে। সুধীর বল্লে,—সে কি? আমি—না না, আ-আমি কেন—সে কি—

তার আমতা আমতা আর শেষ করতে দিলুম না।—ছেলেটা মামার

বাড়ী থেকে ফিরে আসুক, তার পর পয়লা এপ্রিল না হয়, পয়লা মে কোরো, কেমন? বলে টেলিফোন রেখে দিলুম।

বড়বাবুকে এসে বল্লুম, এই বারবার তিনবার হল সার। তবে এবার আর ঠকিনি।

বড়বাবু সব শুনে বল্লেন,—ছি ছি, ছেলে পুলের অকল্যাণ নিয়ে ঠাট্টা, এসব কী কথা? এ অত্যন্ত অন্যায়। বাবুরা সকলেই সুধীরের বুদ্ধির নিন্দে ও আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন।”

আমি বলিলাম—“এ তো দেখছি উল্টো পয়লা এপ্রিল হয়েছিল মাষ্টার মশাই।”

মাষ্টার মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—“হু, এটা উল্টোই হয়ে গেল।”

সিধু বলিল—“এইটে কিন্তু আপনার চরম হয়েছিল, যাকে বলে climax, কিম্বা anti-cilmax-ও বলা যায়, কি বলুন?”

নিমীলিত চোখে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—“হুঁ।”

অবিনাশ শুইয়াছিল। সেই ভাবেই বলিল—“তারপর?”

কয়েক মুহূর্ত্ত মাষ্টার মহাশয় নীরব রহিলেন। তারপর একটি রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন :

“তারপর আর সামান্যই আছে। সারা দিনের ব্যাপার নিয়ে হাসিতে গল্পতে অফিসের কাজ সেদিন আমার এগোয় নি বেশি। পাঁচটার জায়গায় প্রায় পৌনে ছটা হয়ে গিয়েছিল অফিস থেকে বেরোতে। থাকতুম তখন একটা বাড়ীর নীচের তলায় দুখানা ঘর নিয়ে। বাসায় ফিরে দেখি স্ত্রী ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন।”

সিধু কহিল—"য়্যাঁ? যে ছেলে মামার বাড়ীতে ছিল?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"হ্যাঁ, ঐ একটিই ছেলে ছিল। বাবার কাছে যাব, বাবার কাছে যাব, বলে' মামার বাড়ীতে বড় কান্নাকাটি ক'রে ছিল, তাই তার মামা দুপুর বেলায় রেখে গিয়েছিলেন।

ছেলেটার সবে জ্ঞানের মতো হয়েছে। কথা কইতে পারছে না। আচ্ছন্নের মতো আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

যখন পড়ে গিয়েছিল তখন সারা বাড়ীটাতে পুরুষ বলতে বিভিন্ন ভাড়াটেদের গুটি তিন চার শিশু। দৈবাৎ ওপরের ভাড়াটেদের একটি আত্মীয় ছেলে এসে পড়েছিল। সেই ছেলেটিই যাবার সময় কোন দোকান থেকে টেলিফোন করে দিয়ে গেছে। তোত্‌লা নয়, ছেলেমানুষ, টেলিফোনে কথা কইতে নার্ভাস বোধ ক'রে থাকবে। আমি বলেছি অমুক বাবুকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে। বাড়ী সুদ্ধু স্ত্রীলোক ছেলের মাথায় জল দিয়েছেন, হাওয়া করেছেন, আমার স্ত্রীকে ভরসা দিয়েছেন, আর আমার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ করেছেন।

ছেলে নিয়ে ছুটলুম হাসপাতালে। স্ত্রী মানা শুনলেন না, চল্লেন সঙ্গে। ডাক্তারেরা বল্লে—ব্রেণের ভেতর বোধহয় রক্তপাত হচ্ছে, আরও আগে আনা উচিত ছিল।"

আবার মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমাদের কাহারও কথা কহিতে ভরসা হইল না। উগ্র ও

উদ্বিগ্ন কৌতূহল লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের মুদিত চক্ষু দুইটির পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রশ্ন করিতে হইল না, তিনি নিজেই বাকীটুকু বলিলেন।

"দিন পাঁচেক পরে স্বামী স্ত্রীতে ফিরে এলুম শুধু হাতে।

বুড়ী এখনও থাকে থাকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁগা, এত দেরী করে এলে কেন? কখন খবর দিয়েছি, আর একটু আগে আসতে পারলে না? আবার বলে খোকাকে নিয়ে আসবে না, হ্যাগা?

বোধহয় বাহাত্তুরে ধরেছে।"

মাষ্টার মহাশয়ের স্বর ভারী ও মৃদু হইয়া আসিল।

অবিনাশ তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছে। সিধু মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া আছে। মাষ্টার মহাশয়ের দুইটি চোখের কোল বাহিয়া দুই ফোঁটা জল তাঁহার শাদা দাড়ির উপর ঝরিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ

"লোকে বলেছিল আর একটি এলেই দুঃখু ভুলবে। কিন্তু আর তো খোকা ফিরে এল না।

বাহাত্তুরেই হোক আর যাই হোক, বুঝুক আর না বুঝুক, বুড়ীকে সত্যি জবাবই দি। বলি—তক্ষুণি এলুম না পাছে ঠকে যাই, পাছে এপ্রিল্ ফুল হয়ে যাই। দুবার ঠকেছিলুম কিনা, তাই এবার না ঠকে তার দাম দিতে হল।"

ঘরের ভিতর একটি নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে মাষ্টার মহাশয়ই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন।

ক্ষিপ্রহাতে চোখ দুইটি মুছিয়া লইয়া মাষ্টার মহাশয় স্বাভাবিক স্মিত-মুখে বলিলেন "তাই বলে কি লোকে ঠাট্টা পরিহাস করা ছেড়ে দেবে? পাগল! তবে রাগ কোরোনা বাবা, কালকে আমার আসা বোধহয় হয়ে উঠবে না।"

(ভারতবর্ষ—বৈশাখ ১৩৫০)

নামৈব কেবলম্

রবিবারের অপরাহ্ন।

উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে বেলঘরিয়ার গণেশ উকীল হাঁকিলেন, "কোথায় গেলে গো? ওপরে নাকি?" উপর হইতে সাড়া আসিল না, আসিল স্নানের ঘর হইতে। "এই যে আমি, কী হয়েছে?"

গণেশবাবু বদ্ধদ্বারকে বলিলেন, "তবেই হয়েছে! তুমি বুঝি কলে ঢুকেছ? তাইতো! তা চট্ করে এসো। মানে, জামাই এসেছে, বুঝলে? বড্ড তাড়াতাড়ি। চট্ করে একটু চা-টা করে দাও, এক্ষুনি চলে যাবে।"

তারপর কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিনু কোথায় গেলি? একটু জল চড়িয়ে দে মা চট্ করে। আর কিছু খাবার আন্‌তে দে বংশীকে।"

"চট্ করে" বলিলেই পিতার জামাই-এর জন্য জলযোগ প্রস্তুত করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবে এমন নির্ল্লজ্জা কন্যা বিনীতা নহে। গণেশবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে কেট্‌লি লইয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। বৈঠকখানার যে জানালাটি বাড়ীর ভিতর দিকে আছে সেটা বন্ধ থাকিলেও তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময় বিনীতার মাথা নীচু হইয়া আসিল।

তাহার বিবাহ বেশী দিন হয় নাই এবং এ বাড়ীর জামাতা শ্বশুরবাড়ী ঘন ঘন আসেন না। বিনীতা শেষ পত্র যাহা পাইয়াছে তাহাতে শীঘ্র আসিবার চেষ্টা করার বেশী আর কিছু আশার বাণী ছিল না।

মিনিট দশেক পরে গণেশবাবু ভাঁড়ার-ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ কী করেছিস ? এত খাবার আনিয়েছিস কেন রে ?"

বিনীতা নত মস্তকে চায়ের কেট্‌লীতে চামচ নাড়িতেছিল, নিরুত্তরে নাড়িতেই থাকিল। ঘরের ভিতরে গৃহিণী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহার অদৃশ্য কণ্ঠ শোনা গেল, "বাজে ব'কো না বাবু। ও আনাতে যাবে তোমার জামাইয়ের জন্যে খাবার! আমি আনিয়েছি।"

"তা সে যেই আনাও, এত বেশী আনাবার দরকার কী ছিল ?"

চাপা গলায় পূর্ণিমা দেবী ঝঙ্কার দিলেন, "তুমি চেঁচিও না অত, শুনতে পাবে। বেশী আবার কোথায় দেখলে ? এর কমে দেওয়া যায় ?"

অসহায় দৃষ্টিতে গণেশবাবু শালপাতার বৃহৎ ঠোঙার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ণিমা দেবী কন্যার পাশে আসিয়া উবু হইয়া বসিয়া কহিলেন, "যা বিনু তুই ওপরে যা। বড় ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে কাপড়টা বদলে ফেল্। সেই নতুন ডুরেখানা পরিস। আমার আল্‌মারীতে সামনেই আছে।"

বলিয়া অঞ্চলপ্রান্ত হইতে চাবির রিং খুলিয়া বিনীতার হাতে দিয়া নিজেই কাপ্ ডিস টানিয়া লইলেন। মন্থরপদে বিনীতা বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বিনীতা শুনিল পিতা মাতার আলাপ।

"ঐ হয়েছে হয়েছে। চট করে খাবারগুলো গুছিয়ে দাও। অনেক দূর যেতে হবে ওকে। তার ওপরে আবার ট্রেণের সময়।"

—"রাখো বাপু তোমার চট্ করে। তোমার চট্ করে শুনে কাজ করলে তো আমার চলবে না। রোজ তো আর তোমার বাড়ী খেতে আসছে না। আর এক্ষুনি যাবে বল্লেই যাবে? বিনু ঘরটা পোস্কের করে দিক, ওপোরে নিয়ে গিয়ে বসাও।"

পিতা কী বলিলেন তাহা বিনীতা শুনিতে পাইল না। ততক্ষণে সে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু মাতার উচ্চকণ্ঠ কানে আসিল।

—"কী যে বকো তা বুঝি না। তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! ওপরে নিয়ে যাবে না তো কি বাইরের ঘরের থেকেই জল খাইয়ে বিদেয় ক'রে দেবে নাকি?"

ক্ষিপ্রহস্তে গৃহসজ্জায় যথাসম্ভব পারিপাট্য আনিয়া বিনীতা পাশের ঘরে গেল কাপড় বদলাইতে। আলমারী খুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কী চিন্তা করিল। তারপর নিজ হাতে বোনা নূতন পশমের আসনখানি বাহির করিয়া বড়ঘরে ভাল চেয়ারখানিতে পাতিয়া দিয়া গেল। এই আসনটি সে একটী বিশেষ ব্যক্তির জন্যই বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা ইহা প্রথম ব্যবহৃত না হয়, এইজন্য এতদিন ইহাকে বাহির করা হয় নাই।

নূতন কাপড় পরিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখে স্নো ঘষিতে ঘষিতে বিনীতা আপন মনে হাসিয়া উঠিল। বাহিরের ঘরে নূতন জামাতার অভ্যর্থনা করিবার কল্পনা এক তাহার পিতার দ্বারাই সম্ভব! সাধ করিয়া কি মা এত রাগ করেন? এ কি তাঁহার আদালতের কোন বন্ধু আসিয়াছেন যে, বাহিরে বসিয়া একবাটি চা ও দুইটা মিষ্টান্ন খাইয়াই চলিয়া যাইবেন, ভিতরে আসিবার প্রয়োজন নাই!

সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাইয়া বিনীতা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধদ্বার নির্জ্জন কক্ষে নববস্ত্রপরিহিতা বিনীতা লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বন্ধ দরজার একটি পাল্লা এক ইঞ্চি পরিমাণ খুলিয়া সেই ফাঁকটুকুতে একটি চোখ রাখিয়া সে দাঁড়াইল।

ঘরের সামনেই বারান্দা, সেই বারান্দা দিয়াই বড়ঘরে যাইবার পথ। কী কথা হইতেছিল কে জানে। গণেশ বাবুর কণ্ঠই কানে আসিল, অপর পক্ষ সম্পূর্ণ নীরব। বিনীতা অধর উল্টাইয়া ভাবিল পুরুষ মানুষ কত ভণ্ডামিই জানে! প্রয়োজন হইলে সুশীল সুবোধ সাজিতে ইহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

ক্রমে চতুষ্পদ-শব্দ ও কণ্ঠস্বর নিকটবর্ত্তী হইল এবং হাস্যবদন গণেশবাবু একচক্ষু বিনীতার দৃষ্টিরেখা ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। নির্নিমেষে বিনীতা চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই গণেশবাবুর 'জামাই' এক পলকের জন্য দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

এক পলকের দেখাই যথেষ্ট। সমস্ত হৃদয় মন একটি মাত্র চক্ষু-তারকায় সন্নিবিষ্ট করিলে সে চক্ষু যাহা দেখে, সহস্র আঁখি ইন্দ্রও তত দৃষ্টি-শক্তি ধরেন কি না সন্দেহ। কুরুরাজ-কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষায় অর্জ্জুন নিশ্চয়ই এক চক্ষু মুদিত করিয়া অপর চক্ষুর সাহায্যেই লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন। বিনীতার একাগ্র এক চক্ষুতে এক পলকের দেখাই যথেষ্ট। তাহাতেই তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু তথাপি দুই চোখ দিয়া না দেখিলে কম্পমান হৃদয় মানে না। রুদ্ধশ্বাসে বিনীতা একটী কবাট খুলিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল। গণেশ বাবুকে দেখা গেল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তে ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখের ও দেহের এক পার্শ্ব মাত্র দৃষ্টি-গোচর

হইল। দ্রুত মাথা টানিয়া লইয়া বিনীতা দ্বারে অর্গল লাগাইয়া দিল। ঘর্ম্মাক্ত দেহেও তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে নূতন শাড়ীর মায়া ভুলিয়া ধূলিসঙ্কুল পা-পোষের উপরেই সে বসিয়া পড়িল। ক্ষণপরেই পদশব্দে বুঝিল, বংশী ভৃত্য চা ও জলখাবার পরিবেশন করিয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়াছে। গণেশবাবু বাড়ী নাই। অতিথিকে আগাইয়া দিতে গিয়াছেন। নীচে ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাওয়ার উপর পূর্ণিমাদেবী বসিয়া আছেন। বিশ্বের গাম্ভীর্য্য তাঁহার মুখে মাথানো।

অতিথি বিদায়ের পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এইরূপ :—

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া পূর্ণিমাদেবী সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ধনী-সন্তান জামাতাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য এবং অনুরোধ করিবার জন্যও বটে যেন জামাতা রাত্রিবাস না হউক অন্ততঃ রাত্রি ভোজটা এইখানেই সারিয়া যান।

"আজ কি না গেলেই নয় বাবা? রাত্তিরে না হয় খাওয়া দাওয়াটা করে যেওখন। গরীব শ্বশুরের বাড়ী কতদিন পরে এলে—"

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর হইতে তাঁহার নজর চলে না, গণেশবাবুর পশ্চাদ্বর্ত্তী জামাতা একেবারে তাঁহার সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু সম্মুখীন হইবার পর সম্ভাষণ আর অগ্রসর হয় নাই। এ বয়সে এবং এই বাতপুষ্ট দেহে যতটা সম্ভব চঞ্চল চরণে পূর্ণিমাদেবী সরিয়া আসিয়াছিলেন। অতিথিসহ গণেশবাবুও অপেক্ষা করেন নাই।

বিনীতা উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি বড় ঘরের ভিতর নিবদ্ধ। ঘরের ভিতর অন্যান্য আসবাবের মধ্যে একটী ছোট টেবিল ও একখানি গদিমোড়া চেয়ার রহিয়াছে। টেবিলে শুভ্র আবরণীর উপর চায়ের কাপ ডিস, খাবারের রেকাবী, জলের গ্লাস ও পানের ডিবা। চেয়ারে একটী সুদৃশ্য নূতন পশমের আসন। আসনখানি বিপর্য্যস্ত, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ কী চূর্ণ পড়িয়া আছে, একধারে হরিদ্রাভ সিক্তদাগ,—বোধ করি চা পড়িয়া থাকিবে। শুভ্র পশমের উপর চায়ের কলঙ্ক কখনো মোচন করা যাইবে কি না সন্দেহ। উৎসৃস্ট আসনের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিনীতার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তথাপি সে আসন হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

আরও কয়েক মিনিটের পর নীচে পরিচিত চটিজুতার শব্দ পাইয়া বিনীতার চমক ভাঙ্গিল। কখন যে চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল খেয়াল ছিল না। ত্বরিতে চোখ মুছিয়া ঘরের ভিতর হইতে আসনখানা আনিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। তারপর টেবিল পরিস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

উঠানে দাঁড়াইয়া গণেশবাবু দেখিয়া নিরতিশয় বিস্ময় বোধ করিলেন। ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"আহা হা, নতুন আসনখানা কাদায় পড়ে গেল যে। ও বিনু, চট্ করে আয় মা।"

বিনীতা চট্ করিয়া বা ধীরে ধীরে কোন গতিতেই আসিল না। ঘরের ভিতর হইতে নির্বিকার কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ, ওটা আমিই ফেলেছি। ওটা কাচ্‌তে হবে।"

গণেশবাবু আসনখানি নিজেই উঠাইতে যাইতেছিলেন। দ্রব্যটী যে কন্যার কত প্রিয় ও যত্নের তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বিনীতার

উত্তর শুনিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। সদ্য-প্রস্তুত পশমের আসন কাচিবার কী প্রয়োজন হইতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিল না।

কিছু বলিবার জন্যই হউক বা বিস্ময়ের আধিক্যেই হউক, গণেশবাবু মুখ খুলিয়াছিলেন কিন্তু বাক্য নির্গত হইল না। অথবা হইয়া থাকিলেও তাহা শ্রুতি-গোচর হইল না। কারণ তৎপূর্ব্বেই পূর্ণিমা দেবী মুখ খুলিয়াছিলেন।

কেতাবী ভাষায় বলে—"বাক্যবাণ।" কিন্তু কেতাবের বাহিরের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা জানেন, ওটা শব্দশাস্ত্রের অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের প্রেমের সংসার হইলে পতিব্রতা মধ্যবয়স্কা পত্নীর মুখে প্রিয়তম নির্ব্বোধ পতির উদ্দেশে যে বাক্য শোভা পাইয়া থাকে, পূর্ণিমা দেবী তাহাই ব্যবহার করিলেন। তাহাতে গণেশবাবুর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। কারণ বাক্য সত্য-সত্যই বাণ নহে। কর্ণে-ই প্রবেশ করে, চর্ম্মে আঘাত করে না। মর্ম্ম দৃষ্টি গোচর হয় না, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা দুরূহ।

সোমবারে আলিপুরের জজ-আদালতে শ্বশুর-জামাইয়ে সম্পর্কচ্ছেদ হইয়া গেল। আদালত বলিলে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা, হইল আদালতের লাইব্রেরী কক্ষে। দীর্ঘ টেবিলে স্বীয় অভ্যস্ত চেয়ারে বসিয়া গণেশ উকীল সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। অর্থাৎ একখানি সংবাদপত্র খুলিয়া, নিমীলিত-নয়নে, ইলেক্‌ট্রিক-পাখা-তাড়িত ও একশত ব্যক্তির নাসিকা শোধিত বায়ু সেবন করিতেছিলেন। যেমন জনাকীর্ণ সহরই আত্মগোপন করিবার প্রকৃষ্ট স্থান, তেমনি একটানা বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে তন্দ্রা

উপভোগ করিবার চমৎকার সুবিধা আছে তাহা উকীলবাবুরা ও স্কুল মাষ্টার মহাশয়রা জানেন।

এমন সময়ে এক স্থূলোদর, চাপকান-পরিহিত ভদ্রলোক আসিয়া গণেশবাবুর বিপরীত দিকের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। তারপর পকেট হইতে এলুমিনিয়াম-নির্ম্মিত একটী ফিল্মের কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে বিরাট এক টিপ নস্য লইয়া দুইটী সুপ্রশস্ত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক নস্য স্থানাভাবে ঝরিয়া পড়িল চাপকানের ও টেবিলের স্থানে স্থানে। নস্য বর্ণের একখানা রুমাল দিয়া নাক মুখ ঝাড়িয়া লইয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "দিব্যি বাড়ীটি করেছে হে, ছোট হলেও চমৎকার ফাঁকার ওপর। বুঝলে ?"

বলিয়া এপাশে-ওপাশে চাহিয়া ঈষৎ ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু কোন পাশ হইতেই এমন লক্ষণ দেখা গেল না যে তাঁহার মন্তব্য কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। দুই পাশে যে সকল উকীলবাবুরা তাস হাতে বা শুধু হাতে কলরব করিতেছিলেন তাঁহারা কলরব করিতেই থাকিলেন।

ভদ্রলোক তখন দুই পাশ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন "কাল বাড়ী ফিরতে কিন্তু বড্ড রাত হয়ে গেল, বুঝলে শ্বশুর ? তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেণ ধরেছি। কিন্তু ছেলের বাপটা একেবারে কশাই। আজ সকালে ঘটক এসেছিল, শালা দর যা হেঁকেছে, বুঝলে,—কী হে শ্বশুর ঘুমুচ্ছ না কি ?"

তন্দ্রাজড়িত স্বরে গণেশবাবু কহিলেন, "তা তো বটেই।" বলিয়া একবার চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যা, কিসের কথা হচ্ছিল ?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গণেশবাবু পুনরায় চক্ষু মুদিলেন। নস্যাশী ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ ঘুম দিয়ে নিলে, বাঃ।"

"না না ঘুমুবো কেন?" বলিয়া গণেশবাবু নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং সংবাদপত্রের পাতায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "মানে, কাল রাত্তিরে ঘুম হয়নি বল্লেই হয়। তার ওপর মেয়েটার জ্বর না কী হয়েছে বল্লে, রাত্তিরে কিছু খেলে না। তাই ভাবছি—"

ভাবনার ভারে মাথাটী তাঁহার পুনরায় বুকের উপর ঝুঁকিয়া আসিল।

"কিন্তু বাপটা যাই হোক, ছেলেটীকে দেখলুম মন্দ নয়। খাঁইটা যদি একটু কমে তা হলে মনে করছি ঐখানেই—কী বল শ্বশুর?"

সহসা গণেশবাবুর চেতনা পূর্ণ জাগ্রত হইল। মাথা তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "য়্যাইয়োপ্, খবর্দ্দার বলছি।"

অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিস্ফোরণে ভদ্রলোক চমকিত হইলেন। পিছনে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু আক্রমণের পাত্র কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, "আরে স্বপ্ন দেখছ না কি হে? আফিংটা কমিয়ে ফেল, কমিয়ে ফেল, বুঝলে শ্বশুর?"

গণেশবাবু পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ফের্? ভালো হবে না বলছি জামা—ইয়ে—ওর নাম কি, দাশু!"

দাশরথীবাবুর বিস্ময় এবার তাঁহাকে অবাক করিয়া দিল। গণেশ উকীলের ক্রোধ তাঁহার নিকট যত বিস্ময়জনক ঠেকিল তদধিক রহস্যময় লাগিল তাঁহার মুখের 'দাশু' সম্বোধন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া দাশু উকীল কহিলেন, "আরে, হঠাৎ ক্ষেপে গেলে না কি? কি হল তোমার বল তো?"

সেই কয়েক মুহূর্ত্তে গণেশবাবুর উত্তেজনা শীতল হইয়া আসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সহজ সুরে কিন্তু গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন,—

"হয় নি কিছু। কিন্তু বয়েস হয়েছে, তোমারও বটে, আমারও বটে।"

দাশরথীবাবু বলিলেন, "তা তো হয়েছেই ভাই। কিন্তু আমি তো আর বয়েস ভাঁড়িয়ে চুলে কলপ দিয়ে বেড়াচ্ছি না। বয়েসের নিদর্শন শিরোধার্য্য করে রেখেছি, এই দেখ।"

বলিয়া দাশুবাবু আপন কেশ-বিরল পাকা মাথাটীতে হাত বুলাইলেন। গণেশবাবু সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বয়েস হয়েছে তা মানছ তো? তা হলে এখন থেকে মনে রেখো আমার নাম 'গণেশ', আর আমিও মনে রাখতে চেষ্টা করব তুমি 'দাশু'। ছি-ছি-ছি-ছি!"

কাহাকে এই ধিক্কার তাহা দাশরথী উকীল বুঝিলেন না। কিন্তু সে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি বিস্ফারিত-নেত্রে ভাবিতে লাগিলেন, গণেশের নাম•গণেশ এবং তাঁহার নাম দাশু।

কথাটা বোধ করি তাঁহার শক্ত ঠেকিল। তাই মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—

"তোমার নাম গণেশ আর আমার নাম দাশু। কেন বল তো?"

এ প্রশ্ন করার তাঁহার প্রয়োজন আছে। তরুণ বয়সের বাচালতায় কবে তাঁহারা দুই বন্ধু পরস্পরের কাছে নাম হারাইয়া 'শ্বশুর-জামাই'এ পরিণত হন, তাহা গবেষণার বিষয়। নাম ছাড়িয়া বন্ধুকে শ্বশুর বলিয়া ডাকিয়া একদা কী রসিকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সে যুগের দাশরথীই জানিতেন, এ দাশু উকীলের মনে পড়িল না।

স্মরণশক্তি গণেশবাবুরও যে ভালো আছে তাহা নয়। গতরাত্রে প্রবল, ও একতরফা, দাম্পত্য-আলাপের মধ্যে বাক্যহীন গণেশ উকীল অনেক চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারেন নাই কী উপলক্ষে তিনি দাশুকে প্রথম 'জামাই' সম্বোধন করিয়াছিলেন। উপলক্ষ যাহাই থাকুক, এ সম্বোধনে অর্থ ছিল না কিছুই। কিন্তু অনর্থ যে এতখানি থাকিতে

পারে তাহা তখন কে ভাবিয়াছিল। অবশ্যই তখন কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ গৃহিণীও আসেন নাই। তাহার পর কত দীর্ঘকাল কাটিয়াছে। এই দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে গণেশবাবুর একবারও মনে হয় নাই যে, বাহিরে যাহা কেবল নাম ছাড়া আর কিছুই নহে, অন্তঃপুরে বলিলে তাহাই কী বিষম অশোভন শুনিতে হয়, বিশেষতঃ যে অন্তঃপুরে বিবাহিতা কন্যা বর্ত্তমান। ছি-ছি-ছি।

ব্যাপার শুনিয়া দাশরথীবাবুও দাঁতে জিব কাটিলেন।

মেয়ের জন্য বেলঘরিয়ায় পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে বন্ধুর সহিত দেখা হওয়ায় নির্ব্বন্ধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার গৃহে আধঘণ্টা-কাল কাটানো অবশ্য অপরাধ নয়। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই অপরাধ যেন কোথায় একটা হইয়া গিয়াছে, তাহারই লজ্জায় বৃদ্ধ দাশরথী অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন।

অতঃপর আদালতসুদ্ধ লোক সবিস্ময়ে শুনিল, দাশু উকীল বলিতেছেন, "বুঝলে গ—গণেশ," গণেশ উকীল বলিতেছেন—"কী বল হে ইয়ে—ওর নাম কি, দাশু!"

(বঙ্গশ্রী—পৌষ ১৩৪৮)

বড়বাবু

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা'। অর্থাৎ অফিস যত ছোটই হোক, বড়বাবুর প্রতাপ প্রবলই থাকে। সুবিমল বড়বাবু হইয়াছে। তাহার বয়সও বেশী নয়, তাহার অফিসও বড় নয়। তথাপি বড়বাবুর প্রাপ্য মর্য্যাদা সুবিমল ষোল আনাই পাইয়া থাকে। কিন্তু এইখানেই তাহার সহিত জগতের বড়বাবুসম্প্রদায়ের প্রভেদ। অন্য বড়বাবুগণ মর্য্যাদা ষোল আনা মাত্র পাইলেই খুশী হন না, আঠারো আনা ছাপাইয়া আদায় করিয়া লন। আর সুবিমল ষোল আনার ভারেই কাতর ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

কারণ, বড়বাবু হওয়া সুবিমলের প্রিন্সিপ্‌লের বিরুদ্ধে। বাল্যকাল হইতে তাহার বড়বাবু-জাতির প্রতি একটা অহৈতুকী অপ্রীতি আছে। ভাল ছেলে বলিয়া স্কুল কলেজে তাহার সুনাম ছিল বরাবরই। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে তাহার একটা মত ছিল, তাহা তাহারই নিজস্ব এবং দৃঢ়। এ সকল অবশ্য খুবই ভাল কথা, বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত না হইয়াও যখন সে এম-এ পাশ করিবার পরও সত্য ও ন্যায়ের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইতে পারিল না, তখন শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির আশা ছাড়িয়া দিলেন।

নানা বিষয়ে এখনও তাহার মত ও অমত আছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে বড়বাবু অন্যতম ও অমতের ফিরিস্তিভুক্ত। এ জগতে দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, সময়ে সরস্বতী ও অসময়ে রক্ষাকালী পূজার চাঁদা আছে, সাপ এবং আরশুলা আছে, দাঁতের গোড়া ব্যথা ও পায়ের

কড়া পাকা আছে,—কত কী আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মোটের উপর দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। তাহার উপর বড়বাবুগণ জগতের দুঃখ বাড়াইতেই আছেন, ইহাই ছিল তাহার মত। কিন্তু অঘটন ঘটানোই বিধাতার সৃষ্টিপালনের নিয়ম। একদা এই সুবিমলই হঠাৎ বড়বাবু হইয়া আত্মীয় বন্ধুদের স্তম্ভিত করিয়া দিল।

কিন্তু ইহাতে সুবিমলের অপরাধ ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অফিস ছোট। আগের বড়বাবু অকস্মাৎ দেহরক্ষা করাতে এবং সুবিমলের প্রতি সাহেবের সুনজর থাকাতেই তাহার এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়। পদবৃদ্ধি হইল, বেতন বৃদ্ধি হইল, গৃহিণী ও আত্মীয় পরিজন সকলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু সুবিমলের মনে হইল, কাজটা ভাল হইল না। কাহাকে যেন সে প্রবঞ্চনা করিল। অথবা নিজেই যেন কাহার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইল। বড়বাবু-কুলের কুলদেবতা বুঝি বিদ্রোহী নেতাকে ভুলাইয়া আপন সিভিল-সার্ভিসে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। কিছুকাল সুবিমল অতিশয় লজ্জিত হইয়া প্রায় মুখ লুকাইয়া ফিরিতে থাকিল।

কিন্তু উপায় নাই। বড়বাবুত্ব ছাড়িতে হইলে চাকরী ছাড়িতে হয়। অগত্যা সুবিমল কাজ করিতে লাগিল, কিন্তু সতর্ক হইয়া, যেন বড়বাবুসুলভ দুর্ব্বলতা তাহাকে গ্রাস না করে।

অ-বড়বাবু মনোভাব হইলেও সুবিমল বড়বাবুর কাজ এতাবৎকাল ভালই চালাইয়া আসিয়াছে। অধীনে যে কয়জন বাবু আছেন, তাঁহারা নূতন ও নবীন বড়বাবুর মত জানিয়া চেষ্টার সহিত অভ্যাস বদলাইয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে অকারণে 'সার' 'সার' প্রায়শঃই করেন না। শীতকালে আম ও গ্রীষ্মকালে ফুলকপি কিনিয়া আনিয়া, অসময়ের গাছের ফল বলিয়া বড়বাবুকে উপহার দেন না, এবং তাঁহাদের বাড়ীতে পূজার তত্ত্বে

সন্দেশ আসিলে ছেলেদের বঞ্চিত করিয়া বড়বাবুর পূজায় একভাগ ব্যয় করিতেও হয় না।

উড়িষ্যাপ্রদেশী বেয়ারা একটী ও বিহারপ্রদেশী দারোয়ান একটী। দুই জনেই বৃদ্ধ হইয়াছে। ইহারাও এ পর্য্যন্ত বিশেষ অসন্তোষের কারণ ঘটায় নাই। অতএব কালক্রমে বড়বাবুত্বর গ্লানি আর সুবিমলের তত উগ্ররূপে অনুভূত হয় না।

কিন্তু বাঙ্গালাদেশে 'পদ্যপাঠ' না কী যে একখানি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ আছে তাহাতে বলে, "চিরদিন কভু কারও সমান না যায়।" এক্ষেত্রেও শাস্ত্রবাক্য ফলিতে শুরু হইল। অফিসের কাজ ও পুরাতন বেয়ারার বয়স, দুই-ই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এই সত্যটী একদিন সাহেবের মস্তিষ্কে হঠাৎ প্রকট হইল। ফলে সাহেব বৃদ্ধ বেয়ারাকে একটী সহকারী লইতে আদেশ করিলেন। নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ভার বড়বাবুর উপরই রহিল। অফিসের বৃদ্ধ বেয়ারা তাহার এক আত্মীয়-সন্তানকে আনিয়া কাজে লাগাইয়া দিল। নিয়োগ করিল অবশ্য সুবিমল।

নূতন বেয়ারা দীনবন্ধুকে কাজের লোক বলিতে পারা যায়। অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি, দুই-ই তাহার আছে। বাঙ্গালা কথা প্রায় পরিষ্কার কহিতে পারে, তাহার উপর আছে ইংরাজীর অক্ষর পরিচয়। সুতরাং লোকটী অল্পদিনের মধ্যেই সাহেবের ও বাবুদের প্রসন্নতা অর্জ্জন করিল। শুধু সুবিমলের চিত্ত তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারিল না। পারিল না যে তাহার জন্য দীনবন্ধুকে দায়ী করিতে পারা যায় না। তাহার দিক হইতে বড়বাবুর প্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। সুতরাং দায়ী তাহার অদৃষ্টই বলিতে হইবে।

সুবিমল প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিল লোকটা তাহার অর্থাৎ বড়বাবুর সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন। কথায় ও কাজে, সর্ব্বদাই সে সুবিমলকে এই পরম অপ্রিয় কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সুবিমল বড়বাবু। শুধু বড়বাবু নহে, যেমন সাধারণ বড়বাবুরা হইয়া থাকেন যেন সেই রকম বড়বাবুই সুবিমল। সে যে সাধারণ বড়বাবু-জাতীয় বড়বাবু নহে এবং হইতে চাহে না, তাহা দীনবন্ধুর ব্যবহারে মনে করিবার অবকাশ থাকে না।

আদেশ করিলে অগৌণে আদেশ পালন করা ভৃত্য বেয়ারাদের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য তো দীনবন্ধু অখণ্ড মনোযোগের সহিত পালন করেই। পরন্তু আদেশ করিবার পূর্ব্বেই যখন সে মানসকর্ণে আদেশ শুনিয়া লয় ও অগ্রিম তাহা পালন করিতে ব্যগ্র হইয়া ছুটে, তখন সুবিমল অতিশয় অস্বস্তি বোধ করে। বড়বাবুর স্বাস্থ্য, বড়বাবুর সুবিধা ও বড়বাবুর আরামের প্রতি দীনবন্ধুর নিদারুণ ও নিয়ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুবিমলের গায় খোঁচা মারিতে থাকে। আঠারো টাকা বেতনের বেয়ারা দীনবন্ধু আশে পাশে থাকিলে দুইশত টাকা বেতনের বড়বাবু সুবিমল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহার মন যেন হাত পা ছড়াইয়া বসিতে পারে না।

সাধারণ বড়বাবুগণ এ রকম মনোযোগী ও সেবাপরায়ণ বেয়ারা পাইলে বিশেষ প্রীত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দীনবন্ধুর অদৃষ্ট-দোষে তাহার বড়বাবু সাধারণ বড়বাবু নহেন। সুবিমল মুখে না বলিলেও দীনবন্ধু কেমন যেন অনুভব করে তাহার বড়বাবুর এই অপ্রসন্নতা এবং বড়বাবুর মনস্তুষ্টির তপস্যায় দীনবন্ধু যতই অধিকতর আগ্রহে বড়বাবুর উপর মন নিবিষ্ট করে, ততই তাহার মনোনিবেশের প্রাবল্যে সুবিমলের মন তাহার প্রতি আরও বাম হইয়া উঠে। ফলে বেচারা দীনবন্ধুর

সেবাপরায়ণতা ও বেচারা সুবিমলের বিরূপতা দুই-ই পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়াই চলিল।

অবশেষে কী করিয়া কী হইল কেহ বুঝিতে পারিল না, এক সোমবার মধ্যাহ্নে অফিসের সকলে শুনিল, নূতন বেয়ারাকে বড়বাবু জবাব দিয়াছেন। অর্থাৎ চাকরী তাহার এখনও আছে বটে, কিন্তু সে মাত্র আর এক সপ্তাহের জন্য। বুড়া বেয়ারাকে ডাকিয়া বড়বাবু হুকুম দিয়াছেন এক সপ্তাহের মধ্যে অন্য বেয়ারা বন্দোবস্ত করিতে। তারপর এ অফিসে আর দীনবন্ধুর আয়ু নাই।

বুড়া বেয়ারা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, দীনবন্ধুর অপরাধ কী এবং তাহা যাহাই হোক তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বড়বাবু সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন ও লোকটীকে দিয়া চলিবে না।

এ অফিসে চাকরীতে বহাল হওয়ার ঘটনা প্রায়শঃ ঘটে না, এবং চাকরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত আরও বিরল। বাবুরা সুবিমলকে চেনেন। সুতরাং তাঁহারা নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন বড়বাবুর এই অভাবনীয় কঠিন আদেশে। ইহা সুবিমলের চরিত্রের সহিত মেলে না। শুধু বিস্মিত নয়, সকলেই অতি বিষণ্ণ হইয়াছেন।

দুই

এবং বড়বাবুর মনও যে খুশী নাই তাহা আর কেহ না জানিলেও স্ত্রী অরুণার অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। অরুণা বলে সুবিমলের মুখে তাহার মেজাজের থার্ম্মোমিটার আছে, একমাত্র সেই তাহা পড়িতে পারে। অফিস হইতে ফিরিবামাত্র স্বামীর মুখ দেখিয়া অরুণা সন্দেহ করিল অসন্তোষকর কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু কৌতূহল অপেক্ষা বুদ্ধি তাহার বেশী। এবং নারী হইয়াও তাহার একটী গুণ আছে। সে অপেক্ষা করিতে জানে। তাই জলযোগান্তে সুবিমল যখন ইজিচেয়ারে দেহ এলাইয়া সিগারেট ধরাইল, মাত্র তখনই অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—

"কী হয়েছে গা ?"

সুবিমল কহিল, "কার কী হয়েছে ?"

"তোমার গো, আবার কার ? আপিসে কিছু গোলমাল হয়েছে বুঝি ?"

সুবিমল বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "অফিসে ? না, অফিসে আবার কী হবে ? কিছুই তো হয় নি ?"

দক্ষিণে ও বামে মাথা নাড়িয়া অরুণা বলিল, "উঁ-হুঃ, তুমি বল্‌লেই আমি শুনব ? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আপিসে না হোক্, কোথাও কিছু হয়েছেই। আমার থার্ম্মোমিটার মিছে কথা বলে না। তোমার মনটা আজ ভাল নেই, সত্যি কি না বল ?"

সুবিমলও মাথা নাড়িল, উর্দ্ধ ও অধঃদিকে। তাহার মনে পড়িল অফিসের কথা। বলিল, "হুঁ, হয়েছে বটে। বড়বাবু হওয়ার সুখভোগ

হচ্ছে। তখনি বলেছিলুম—যা' ভালবাসি না তাই।" তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

পাওয়াই স্বাভাবিক। বড়বাবু হইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না, বড়বাবু হইয়া সে তাহার আদর্শচ্যুত হইয়াছে। অথচ এই বড়বাবু হওয়ার জন্য অরুণা দুঃখ ও লজ্জাবোধ তো করেই না বরং অতীব খুশী হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে যে বড়বাবু হইয়াই থাকিয়া যাইতে হইয়াছে এবং সংসারের কথা ভাবিয়া সে যে আদর্শরক্ষার জন্য চাকরী ত্যাগ করিবার মত বল সঞ্চয় করিতে পারে নাই, ইহার জন্য তাহার মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্রোধ সর্ব্বদাই চাপা থাকে। সুযোগ পাইলেই তাহা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেন একমাত্র অরুণার অবিবেচনাতেই তাহাকে প্রতিদিন বড়বাবু হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে।

বুদ্ধিমতী অরুণা স্বামীকে চেনে। তাই কী সে ভালবাসে না ও কী-ই বা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল না। সে বুঝিল বড়বাবু হওয়ার কণ্টক কোনো বাস্তবিক বা কাল্পনিক কারণে আবার নূতন করিয়া স্বামীকে পীড়া দিয়াছে। স্বামীর দুঃখে অরুণার সহানুভূতি নাই, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি গভীর অবিচার করা হইবে। কিন্তু এই একটা বিষয়ে অরুণা সুবিমলের দুঃখকে ছেলেমানুষির পর্য্যায়ে ফেলিয়া কৌতুক বোধ করিয়া থাকে। হাসিমুখে অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কী আবার সুখভোগ হ'ল গো এত দিন পরে? কে বুঝি বড়বাবু বড়বাবু করেছিল?"

অরুণার অনুমান সত্যের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সুবিমল বিরক্ত হইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে বলিল, "দেখ, যতই লেখাপড়া শেখো, মেয়েমানুষের মাথা যাবে কোথা? বড়বাবু বড়বাবু করার ভেতরের

অর্থ-টা তোমাদের মাথায় কিছুতেই আস্‌বে না। শুধু কথা হিসেবে ওটা কিছু মন্দ কথা নয়। কারণ কথাটা শ্লীলতার বাইরেও নয় আর রাজদ্রোহমূলকও নয়। বরং অনেকের কানে বড়বাবু ডাকটা খুবই মিষ্টি লাগে।"

এই অনেকের কানের ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট ও পুরাতন। অরুণার বড়দাদা,—সুবিমলের চেয়েও বয়সে অনেক বড়,—একটী অফিসের বড়বাবু এবং অনেক দিনের বড়বাবু। সুবিমল বড়বাবু হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ইঙ্গিত অরুণাকে প্রায়ই শুনিতে হইয়াছে। সে কোন জবাব করিল না। অতএব সুবিমলের উত্তেজনা বাড়িয়া উঠিল।

সুবিমল উঠিয়া বসিল। এতক্ষণ সিগারেট ওষ্ঠাধরের মধ্যে ঢুলিতেছিল, এখন তাহা নামাইয়া বামহাতে লইয়া ডানহাতের তর্জ্জনী উঁচু করিয়া সুবিমল কহিল, "কিন্তু প্রত্যেক কথার একটা শক্তি আছে, তা' জানো? শব্দই ব্রহ্ম। কোনো কোনো কথার যেমন শক্তি আছে ভাল ক'রবার, কতকগুলো কথার আবার তেমনি খুবই অনিষ্টকারী শক্তি আছে। ক্রমাগত বড়বাবু বড়বাবু ক'রে একটা লোককে কতটা conceited করা যায় তা' কখনো ভেবেছ? আর যে করে তারও slave mentality বেড়েই চলে। ফলে উভয় পক্ষেরই mental degradation যা' হয় তা' তোমরা বড়বাবুর ভক্তের দল ভাবতেই পারো না।"

অরুণার প্রকৃতি অতি বেয়াড়া। সে আরশোলাকে পর্য্যন্ত ভয় করে না, এবং স্বামীর তিরস্কারেও ভীত হয় না। কিন্তু বক্তৃতাকে তাহার অতিশয় ভয়। নানাবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও সুবিমলের চরিত্রে একটী মহৎ দোষ আছে। সে নিজে যাহা ভাল কিম্বা মন্দ বলিয়া বুঝিত তাহা যে ভালই বা মন্দই, ইহা হাতের কাছে কাহাকেও পাইলে নিতান্ত

নিবিড়ভাবে বুঝাইতে শুরু করে, এবং তাহার ভাবপ্রবণ প্রকৃতিতে অতি শাদা কথাও অচিরে বক্তৃতার সুর ও রূপ ধরে। আরও বিপদ এই, বিবাহের পর হইতে সুবিমল হাতের কাছে স্ত্রীকে যত বেশী পায় এত আর কাহাকেও নহে।

শব্দ-ব্রহ্মের সূত্র হইতে পাছে সুবিমলের কথা বক্তৃতার রজ্জুতে পরিণত হইয়া অরুণাকে বন্ধন করিতে শুরু করে, এই ভয়ে অরুণা তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, তা কী আর জানি না। সত্যিই তো, একেই আমাদের দেশের লোকদের মনে slave mentality ভরা, তার ওপর বড়বাবু বড়বাবু ক'রে তাদের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবি—"

সুবিমল ধমক দিয়া বলিল, "মিছে কথা বোলো না অরুণা, তুমি এ নিয়ে কোনদিন কিছু ভাবো নি। মিথ্যে তোমাকে তোমার বাবা দু বচ্ছর কলেজে পড়িয়েছিলেন। দেশের সত্যিকারের দুর্গতি যে কোথায়, তা তোমরা ভাবতেই পার না। এই তুমি, শিক্ষিতা মহিলা বলে সমাজে চলে যাচ্ছ, কিন্তু সারা দিনে রাতে সংসারের কুটনো বাটনা আর পাশের বাড়ীর বৌয়ের নিন্দে ছাড়া তোমার লাইফের আর কোনও interest যে আছে এ পরিচয় ককৃখনো পাওয়া যায় কি? খবরের কাগজ একটা করে নাও, পড় শুধু বায়োস্কোপের আর সিল্ক্-কুঠীর বিজ্ঞাপনগুলো। আসল কাজে লাগে কাগজ শুধু ছেলেদের দুধ গরম করবার সময় আর তাদের বেড্প্যানের বদলে।"

স্বামীর সহিত আলাপে অরুণার সবচেয়ে গর্ব্ব ও বিপদের কথা এই, যে সুবিমল যখন শিক্ষিত নারীজাতি সম্বন্ধে অভিযোগ করে তখন একমাত্র অরুণাকে সম্বোধন করিয়াই তাহা করিয়া থাকে। ভাবিয়া

দেখিলে ইহাতে আনন্দ হয় বই কি। অরুণার স্বামীর চোখে অরুণা ব্যতীত জগতে আর শিক্ষিতা নারী নাই। কিন্তু সব সময়ে ভাবিয়া দেখিবার মত সময় বা মন থাকে না। একমাত্র নিজেকেই সকল অপরাধের আসামী রূপে দেখিয়া অরুণা বড়ই বিপন্ন বোধ করে। ভুলিয়া যায় যে সে অপর সহস্র আসামীদের প্রতিনিধি মাত্র।

সুবিমল বলিয়া চলিল, "দেশের লোকের অধঃপতন যে কতদূর হয়েছে তা ভাবলে তোমার হাসি বেরিয়ে যাবে।"

অরুণা বলিল, "কই, আমি হাসি নি তো।" বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূকুটির সহিত স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া সুবিমল বলিল, "রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ ক'রে গরীব কেরানী পর্য্যন্ত একটা লালমুখ পুলিশসার্জ্জেণ্ট দেখলে একেবারে তটস্থ। বাঙ্গালীর কানে কে যে প্রথম "Sir" মন্তর শুনিয়েছিল তা জানি না, কিন্তু হতভাগা বাঙ্গালী লজ্জা, ভয়, ঘৃণা ত্যাগ করে, আজও সেই মন্তর জপ করে চলেছে। বাঙ্গালীর মাথা খুব উর্ব্বর কি না, "Sirএর শেকড় তার মাথাময় গেড়ে বসেছে। কতদিনে যে তাকে উপড়ে ফেলতে পারা যাবে তা ভগবানই জানেন।"

শব্দ-ব্রহ্মের উপর আবার বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া অরুণা প্রকৃতই সন্ত্রস্তা হইল। চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী যখন দেশের জন্য দুঃখবোধ করেন, তখন তাঁহার কাছে বাঙ্গালীর ভীরুতা, বাঙ্গালীর আলস্য, বাঙ্গালীর অসাধুতা—এককথায় বাঙ্গালীর পরিপূর্ণ অপদার্থতা অপেক্ষা মুখরোচক বক্তৃতার বিষয় আর কিছু নাই। দেশের দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া যতই তাঁহার হৃদয় ক্রন্দন করিতে থাকে ততই

প্রবল ও প্রখর ভাষায় তিনি গালি পাড়িতে থাকেন এই ভূতলে অধম বাঙ্গালীজাতিকে।

বিপদের সূচনা বুঝিয়াই অরুণা আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতেছিল। বক্তৃতার ফাঁকে সুবিমল সিগারেটে টান দিবার জন্য থামিতেই সে মহা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ঐ যাঃ, পানের জায়গাটা বুঝি তুলতে ভুলে গেছি। ঝি মাগি দেখতে পেলে আর কিছু বাকী রাখবে না।" বলিতে বলিতে সে ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট তিনচার পরে ফিরিয়া আসিয়া অরুণা দেখিল সুবিমল পুনরায় ইজিচেয়ারের পিঠে পিঠ মিলাইয়া সিগারেট টানিতেছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া অরুণা আগাইয়া আসিল।

যাহাতে আবার বক্তৃতার জ্বর না আসে, ও জ্বরের ধমকে সুবিমল খাড়া হইয়া না বসে, সেই জন্য অভিজ্ঞা অরুণা আগে হইতেই স্বামীর মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়া ধরিল। অর্থাৎ নিঃশব্দে চেয়ারের পিছনে আসিয়া সুবিমলের কেশের মধ্যে ধীরে ধীরে আপন চম্পক অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া দিল। সুবিমলের বিবাহিত জীবনে ইহা একটী পরম বিলাস। আরামে তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল। অরুণা তাহার থার্ম্মোমিটারে পড়িল ধীরে ধীরে স্বামীর মেজাজের তাপরেখা নামিয়া আসিতেছে।

কিন্তু বুদ্ধি বেশী থাকিলেও অরুণা নারী তো বটে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁগা, আপিসে কী হয়েছে তাতো বল্লে না?"

নিমীলিত-নয়নে সুবিমল কহিল, "হয় নি বিশেষ কিছু, মানে এমন কিছু নয়। নতুন একটা বেয়ারা এসেছিল কদিন, সেটাকে জবাব দিয়ে দিইছি।"

"কাকে গো? সেই দীনবন্ধুকে? আহা, কী করেছিল সে?"

সুবিমল ঊর্দ্ধনেত্রে অরুণার মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি চিনলে কী ক'রে? নতুন বেয়ারার নাম যে দীনবন্ধু তোমায় কে বল্লে?"

"ওমা, তোমায় বলি নি বুঝি? সে যে দু'দিন এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। তুমি বাড়ী ছিলে না। এলেই আমাকে পেন্নাম করে। 'মা মা' বলে কত গল্প করে, দেশের কথা, একথা সে কথা। তোমার সুখ্যেতে তার মুখে ধরে না। লোকটী তো মন্দ নয় বাপু"

সুবিমল আবার চক্ষু মুদিয়া কহিল, "হুঁ, ঠিকই করেছি তা'হলে। বেটা কাজকর্ম্ম যতটুকু শিখেছে তার চেয়ে বেশী শিখেছে খোসামুদিটা। অফিসে আমাকে খোসামোদ করেই ওর হ'ল না, আবার বাড়ীতে আসে তোমার মন ভিজিয়ে রাখতে। বেশী সেয়ানা কি না?"

অরুণা কহিল, "তা এলেই বা। এসেছে বলে আর এমন কী অন্যায় করেছে?"

সুবিমল বলিল, "না, অন্যায় করেছে তা কি আমি বলছি? কিন্তু ওর কাকা, আমাদের বুড়ো বেয়ারা ঈশ্বর, এতদিনের মধ্যে ক'দিন তোমার কাছে এসেছে? ঐ যে বল্লুম বেশী সেয়ানা কি না।"

সকল প্রকার তোষামোদ-অসহিষ্ণু স্বামীর নিকটে দীনবন্ধুর অপরাধ অনুমান করিতে অরুণার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "তাই বলে' বেচারীর চাকরীটা যাবে? আহা, গরীব মানুষ! এ বাপু তোমার লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হচ্ছে।"

দীনবন্ধুর অপরাধের তুলনায় তাহার শাস্তিটা অতি গুরু হইয়াছে কি না, এই সন্দেহে সুবিমলের চিত্তে অস্বস্তি ছিলই। সুতরাং

অরুণার মুখে ঠিক সেই কথাই শুনিয়া ও তাহার কণ্ঠের সহানুভূতির সুরের মধ্যে সুবিমলের ন্যায়বিচারের প্রতি কটাক্ষ অনুভব করিয়া তাহার তর্ক-ইচ্ছা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল। আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে তোষামোদ-প্রবৃত্তির ভয়াবহতা সম্বন্ধে ভয়াবহ রকমের কিছু বলিতে উদ্যত হইয়া সে উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মাথার উপর সঞ্চরণশীল কোমল ও লীলায়িত স্পর্শের অনুভূতিসুখে সে ইচ্ছা দমন করিয়া পুনরায় নিমীলিত নয়নে সিগারেট টানিতে লাগিল।

মিনিট দুয়েক পরে সুবিমল কথা কহিল। কণ্ঠে তর্কের ঝাঁঝ নাই। কহিল, "দেখ অরুণা, শরীরের ভালমন্দ প্রায় সব সময়েই প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা সাবধান হতে পারি। যদিও যতটা হওয়া দরকার ও উচিত তার সিকিও আমরা হই না। হ্যাঁ, তুমি সেই নতুন ওষুধটা খাচ্চ না তো?"

অরুণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কতবার জিজ্ঞেস করবে? সকালে তো বল্লুম।"।

"বেশ। হ্যাঁ, শরীরের স্বাস্থ্য আমরা যদিও বা একটু আধটু দেখি কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে আমরা একেবারে hopelessly উদাসীন। মনেরও একটা স্বাস্থ্য আছে সেটা মানো তো?"

অরুণা স্বামীর মাথায় একটা পাকা চুল দেখিতে পাইয়াছিল। সেটাকে বাগাইয়া ধরিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়া সুবিমলের মূল্যবান বাণীর শেষাংশ শোনে নাই। পত্নীর উত্তর না পাইয়া সুবিমলের কণ্ঠ উচ্চ হইল—"কি গো, মানসিক স্বাস্থ্য তুমি মানো না?"

পাকা চুলটী অতি সাবধানে করায়ত্ত করিয়া অরুণা বলিল, "না না, আমি বলছি—"

সুবিমল কণ্ঠ আরও একগ্রাম চড়াইয়া বলিল, "কী আশ্চর্য্য! এতে আবার বলবার কী আছে? আজকের দিনে mental hygiene মানে না এমন লোকও আছে?"

কেশোৎপাটন সমাধা হইল। খুশী মনে অরুণা বলিল, "য়ঁ্যা? mental hygiene? বাঃ, তা আর বলতে। মনের স্বাস্থ্যই তো আগে। তা নইলে শরীরের স্বাস্থ্য আসতেই পারে না।"

সুবিমলও খুশী হইল। কহিল, "কিন্তু তোমার এই দীনবন্ধু-জাতীয় লোকের সংস্পর্শে বেশীক্ষণ কাটালে সেই মানসিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট হানি হয়। আচ্ছা, আজকের ব্যাপারটা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে বেটার খোসামুদির ধারাটা। আজ অফিস যেতে একটু দেরী হয়েছিল তা তো জানো? আমি হলের ভেতর ঢুকছি দেখি দীনবন্ধু আমার গ্লাসটায় জল ভরে টেবিলে রাখছে। আমার টেবিল হলের একেবারে শেষ প্রান্তে, ও আমাকে দেখতে পায় নি। তারপর এসে বসেছি মাত্র, দীনবন্ধু 'দণ্ডবৎ' করে পাখাটা খুলে দিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের ধারে। বল্লুম, কী চাই? বল্লে, আজ্ঞে না, কিছু চাই না, বড়বাবুর শরীরটা কি তেমন ভাল নেই আজ? এইরকমের প্রশ্ন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিন ও আমাকে করবেই। দেখ, আত্মীয়তা খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু প্রত্যহ চাকর বেয়ারার সঙ্গে আত্মীয়তা করা আমার সুখকর বলে মনে হয় না।"

অরুণা হাসিয়া বলিল, "তা সত্যি বাবু। এরকম বাড়াবাড়ি কার ভাল লাগে বল?"

সুবিমল বলিল, "সোমবারে টেবিলে দুদিনের মেল জমে ওঠে, মন তখন সেই দিকে। তার ওপোর আবার অফিসে আসতেই বেলা হয়েছে, আমার তখন দীনবন্ধুর সঙ্গে 'হা-ডু-ডু' (How d'ye do) করবার মত মন নয়। ইচ্ছে করল দি বেটার কান ধরে হলের বার করে। কিন্তু তা না করে বল্লুম, না শরীর ভালই আছে, আচ্ছা, তুমি যেতে পার। তা কি বেটা যাবে। বেটা তখন করলে কি জান? আমার জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে থিয়েটারি স্বগতোক্তি করলে 'জলটা গরম হয়ে গ্যাছে'। বলে' গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে জল ফেলে আবার কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে রেখে গেল। বুঝতেই পারছ, আগের জলটা দু' মিনিটও হয় নি ভরে রেখেছে, কাজেই সেটা গরম হয়ে যাবার কথা একেবারেই মিথ্যে। এ কেবল আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা। আমাকে দেখানো যে আমার সুখ-সুবিধের দিকে ওর কী সজাগ দৃষ্টি।"

অরুণা কহিল, "তা সেটা কি মন্দ? ও তোমার চাকর, তুমি বলবে তোমার নয়, আপিসের চাকর—কিন্তু আপিস তো ওদের রেখেছে তোমাদের কাজ করবার জন্যেই। কাজেই তোমার সুখ-সুবিধে দেখা, তোমাদের সেবা করাই ওদের কর্ত্তব্য নয় কী?"

সুবিমল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি আমার পয়েণ্টটা ঠিক ধরতে পারনি, অরুণা। কিম্বা ধরেও মিছে তর্ক করছ। আমাদের সেবা করা ওর কাজ সেটা আমিও জানি। তাই তার সেবা করাতে তো আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ যে একটা ইয়ে—মানে একটা ভান—অর্থাৎ ostentation, ঐ ভড়ংটা আমি সহ্য করতে পারি না। প্রত্যহ বেয়ারা এসে কুশল প্রশ্ন করবে, বিনা কাজে আশে পাশে ঘুর্

ঘুর্ করবে, শ্রীরাধিকার মত জল ফেলে জল আনতে যাবে,—এগুলো তো ওর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নয়।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সুবিমল বলিল, "তারপর আরও আছে শোনো। কী একটা কাজে সাহেবের ঘরে গেছি, ফেরবার সময় একাউন্ট্যাণ্ট বুড়ো প্রফুল্লবাবুর টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কইছি। ব্যস। শ্রীমান দীনবন্ধুর কোমল হৃদয় অমনি কেঁদে উঠল। তিনি আমার পেছনে লাগলেন, শুধু হাতে নয়, একখানি চেয়ার সমেত।"

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা? চেয়ার কী হবে?"

সুবিমল কহিল, "য়্যাঃ, তুমি দেখছি আমাকে দীনবন্ধুর মতন ভাল-বাস না। তা' বাসলে বুঝতে পারতে যে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কী অসহ্য কষ্ট হয়। আর সে কষ্ট তোমার বুকে শেল-সম বাজতো, যেমন দীনে বেটার বুকে বাজে।"

অরুণা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তুমি বকো না বাবু। তারপর কী হ'ল বল।"

সুবিমল কহিল, "তুমি হাসছ, কিন্তু ওর জ্বালায় আমার কোথাও গিয়ে এক মিনিট দাঁড়াবার জো নেই। ওর ঐ চেয়ার নিয়ে তাড়া করার ভয়ে আমাকে প্রায় সিট্ থেকে ওঠা ত্যাগ করতে হয়েছে। যেখানে দাঁড়াব অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে আমার পেছনে রাখবেই। বাবুরা হাসে। অবশ্য আমাকে উপহাস ক'রে হাসে না, দীনবন্ধুর ব্যাপার দেখেই হাসে। কিন্তু আমার তো হাসি আসে না, গা জ্বলে যায়।"

দীনবন্ধু-তাড়িত স্বামীর দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া অরুণার মুখ চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার সৌভাগ্যবশতঃ সুবিমল

তাহা দেখিতে পাইল না। সে বলিল, "আজ তাই তাকে ডেকে ব'লে দিলুম, এখানে তার স্থবিধে হবে না। মাস কাবার হ'তে আর দিন সাতেক আছে, এর মধ্যে অন্যত্র চাকরী দেখে নিক।"

অরুণার মুখের হাসি নিবিয়া গেল। কিন্তু সে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না। করিল না বলিয়াই স্থবিমলের চিত্তে পুনরায় স্বস্তির অভাব হইল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে বলিল, "কী গো, কিছু বলছ না যে?"

অরুণা বলিল, "কী বলব? সত্যিই তো, তোমার অস্থবিধে হচ্ছে, তুমি আপিসের বড়বাবু, একটা বেয়ারা পছন্দ না হ'লে আর একটা বেয়ারা রাখবে। তাতে আমি কী বলব?"

অরুণার কথায় না আছে ব্যঙ্গের স্থর, না আছে দরিদ্র দীনবন্ধুর জন্ম অনুযোগ বা অনুরোধ। এবং বড়বাবুর ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাহার কথায় যুক্তির অভাব নাই! ইহা স্থবিমলের ভাল লাগিল না। সে হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "থাক, আর মাথায় হাত বুলোতে হবে না। শোনো, সামনে এসো। আমি যে বড়বাবু তা' আমি জানি, কিন্তু তুমি যে মনে করছ—"

অরুণা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "না গো, তা' আমি মনে করিনি। আমি মনে করিনি যে তুমি বড়বাবু হ'য়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করছ, লোকের হাতে মাথা কাটছ।"

স্থবিমল পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া সামনে আনিয়া বলিল, "দীনেটাকে ওর কাকা, মানে আমাদের বুড়ো বেয়ারা ঈশ্বর, ঠিক অন্য কোথাও ঢুকিয়ে দেবে। ওদের সব অফিসেই ভাই ব্রাদার আছে। ভদ্দর লোকের চাকরী গেলে চাকরী পাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু ওরা চটপট চাকরী জোটায়। ওর জন্যে তুমি ভেবো না অরু, বুঝলে?"

অরুণা বুঝিল। বুঝিল এ আশ্বাস তাহাকে নহে, সুবিমল নিজেকেই দিতেছে। বলিলে সুবিমল স্বীকার করিবে না, কিন্তু দীনবন্ধুকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাহার আসন্ন অন্নচিন্তায় সুবিমল বোধ করি দীনবন্ধুর অপেক্ষা কম কাতর হয় নাই। ইহা অরুণার অজ্ঞাত নহে।

তিন

সন্ধ্যার পর দীনবন্ধু আসিয়া উপস্থিত। সুবিমল তখন ক্লাবে গিয়াছে। তাহার জন্য দীনবন্ধুকে নিরাশ হইতে দেখা গেল না। বরং বড়বাবুর সে সময়ে বাড়ী না থাকাই তাহার হিসাবের মধ্যে ছিল। তবু বাহিরে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সোজা ভাঁড়ার ঘরের সামনে রকে উঠিয়া একটী ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ করিল। ঘরের ভিতর অরুণা বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। বাহিরে আলো আঁধারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই। কিন্তু দীনবন্ধুর মত লোক অপ্রতিভ হয় না। সে নিজেই পরিচয় দিল, "মা আমি আপনার চাকর দীনবন্ধু।"

অন্যদিন হইলে হয় তো অরুণা বলিয়া ফেলিত, "কে দীনবন্ধু?" কিন্তু আজ কিছুক্ষণ আগেই দীনবন্ধু-তত্ত্ব প্রচুর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভুল করিবার অবকাশ নাই।

সে কহিল, "এসো এসো, ভাল আছ তো দীনু?" বলিয়াই তাহার মনে হইল ঠিক আজকের দিনেই দীনবন্ধুকে কুশলপ্রশ্ন করাটা ভাল শুনাইল না। এবং এই কুশলপ্রশ্নের পথ ধরিয়া যে অচিরে দীনবন্ধুর অনুযোগ ও আবেদনের স্রোত আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা অরুণার প্রখর সহজ বুদ্ধিতে অনুমান করিতে ভুল হইল না।

হইলও তাহাই। বুদ্ধিমান দীনবন্ধু এ সুযোগ ত্যাগ করিল না। তাহার আবেদন উত্থাপন করিবার,—যে উদ্দেশ্য লইয়া আজ তাহার বড়বাবুর অসাক্ষাতে মা'র নিকট অভিযান,—উত্থাপন করিবার জন্ম আর ভনিতার প্রয়োজন হইল না।

ঘণ্টাখানেক পরে, সজল চক্ষু মুছিয়া প্রায় হাসিমুখে দীনবন্ধু যখন বিদায় লইল তখন এটুকু ধারণা লইয়া সে গেল যে চাকরী যদি তাহার ইহার পরও যায়, তবে বুঝিতে হইবে সে-চাকরী রক্ষা করিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও পারিতেন না। অরুণার স্বভাব-স্নেহশীল মন পূর্ব্ব হইতেই ভিজিয়া ছিল, দীনবন্ধু তাহাকে গলাইয়া দিয়া গেল।

বিপদ হইল অরুণার। দীনবন্ধু লোকটি একটু বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া সময় সময় যে নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া ফেলে, সেটুকু বাদ দিলে তাহাকে মন্দলোক বলা যায় না। অরুণার ধারণা হইল লোকটি প্রকৃতই দুস্থ ও স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির অন্ন-সংস্থানের চিন্তায় কাতর। ছোট অফিসে কাজ বেশী নয়, বেতনও খুব কম নয়, বাবুদের ব্যবহার ভাল, এরকম চাকরী ছাড়িতে হইলে ব্যাকুল হইবারই কথা। তাহা ছাড়া তাহার না কি জমি-জমা বিশেষ কিছু নাই, বেশীদিন বেকার বসিয়া থাকিলে অনায়াসে সংসার চলিবে এমন কোন ব্যবস্থাই সে দেশে রাখিয়া আসিতে পারে নাই, ইত্যাদি নানা কথায় সে অরুণার এজলাসে তাহার মামলা ভালোই চালাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি তো তাহার এজলাসে হইবে না। তাই অরুণার দুশ্চিন্তা সে কী করিয়া স্বামীর কাছে দীনবন্ধুর কথা পাড়িবে। কথা তুলিতে গেলেই প্রথমে দিতে হয় তাহার আবার আগমনের সংবাদ। আর তাহা হইলে

সুবিমল যে দীনবন্ধুর আগমনকে তোষামোদ-প্রচেষ্টা ভিন্ন আর কিছু ভাবিবে সে সম্ভাবনা কম। সুতরাং উপর আদালতে মামলা প্রবেশ-লাভই করিবে না, জয়লাভ তো দূরের কথা।

দিন তিনেক কাটিয়া গেল। অরুণা বড় উকীল নয়; মোকর্দ্দমা হাতে লইয়া সে মক্কেলের কথা ভোলে নাই। কিন্তু এই তিন দিনের মধ্যে সে একদিনও সুযোগ পাইল না সুবিমলের কাছে কথা তুলিতে। ঠিক এই সময়ে আবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাটীতে বিবাহ ব্যাপারে সুবিমলকে কয়দিন অফিসের ফেরৎ সেখানে যাতায়াত করিতে হইতেছিল। রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আহারাদি সারিয়া যতটুকু সময় ঘুম আসিতে লাগে তাহা বিয়ে বাড়ীর গল্প করিতেই ফুরাইয়া যায়। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত স্বামীর সহিত তখন আর পরের হইয়া মামলা লড়িতে অরুণারও মন চাহে না।

কিন্তু যত সময় যায় তাহার মনে হয় সবই বৃথা যাইতেছে। সপ্তাহ পূর্ণ হইতে আর দেরী নাই। বেচারা দীনবন্ধু! যে তাহারই উপর একান্ত নির্ভর করিয়া দিন গুণিতেছে,—তাহার চাকরীর তরী একবার ডুবিয়া গেলে আর কি পুনরুদ্ধার হইবে? ফাঁসীর পর আপীল করিয়া কী ফল? কোমল-হৃদয়া অরুণা কল্পনার চোখে দেখে দীনবন্ধুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা উড়িষ্যার সুদূর গ্রাম হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য। বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়া অরুণাকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার নিজেকে দীনবন্ধু ও তাহার অসহায় পরিবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছে। কাজ হাসিল না করিয়া সে উচ্চপদ হইতে সসম্মানে নামিয়া আসিবার কোন উপায় নাই। অরুণা বড়ই বিপদে পড়িল।

চার

শুক্রবার সকালে এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। কী কারণে সেদিন অফিসের ছুটি ছিল। অনেক কেরানীর মত সুবিমলের সংসারেও নিত্য বাজার চাকরের হাত দিয়াই সম্পন্ন হইত। কেবল রবিবার ও ছুটির বারে সুবিমল নিজে বাজারে যাইত। গৃহিণী ও ছেলেরা খুশী হইত, সেদিন ভাল ও বেশী মাছ তরকারী আসিবে, খাওয়া-দাওয়াটা অন্যদিনের অপেক্ষা সুচারু হইবে। যথারীতি সেদিনও সুবিমল বাজারে গিয়াছিল। দুই তিন প্রকার মাছ কিনিয়াছে, তাহার মধ্যে একটী নাতিবৃহৎ আস্ত রুই মাছ। উঠানে মাছ কোটার পর্ব্ব শুরু হইয়াছে, ছেলেরা মাছের আশে-পাশে কলরব করিয়া ঘুরিতেছে। অরুণা ভৃত্য গোকুলকে বিভিন্ন তরকারির জন্য বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের মাছ কুটিবার নির্দ্দেশ দিতেছে।

কয়দিন আকাশের মুখ ম্লান ও গম্ভীর ছিল, মধ্যে মধ্যে বর্ষণও হইয়া গিয়াছে। আজ সকালে মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশের হাসি দেখা দিয়াছে। ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাওয়ায় একটী মোড়ায় বসিয়া, দেয়ালে ঠেস্ দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সুবিমল আপন গৃহের এই শান্তির হাওয়াটি সকাল বেলার উজ্জ্বল আলো ও শীতল বাতাসের সঙ্গে গভীর তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। নিজের হাতে গড়া স্বচ্ছল সুখের সংসারে গৃহিণীপণা করিবার আনন্দ সদ্যস্নাতা অরুণার সুন্দর মুখে একটী গম্ভীর শ্রী দান করিয়াছে। সেই প্রসন্ন ও প্রশান্ত প্রিয়-মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুবিমলের মনে হইল, এই নারীরত্নকে অদেয় তাহার কিছুই

নাই। মনে হইল, রাজা দশরথের মতো সে অরুণাকে বলে, 'অরুণা, তুমি আমার পত্নীরূপে, আমার গৃহিণীরূপে, আমার প্রিয়ারূপে, তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রেমে আমাকে যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়াছ, তাহার জন্য বর দিব। তোমার যাহা প্রার্থনীয় আছে বল, যদি মানুষের সাধ্য হয়, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি তাহা আমি পূর্ণ করিব।' কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীকে মাত্র দুইটি বর দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সুবিমলের মনে হইল দশরথ কী কৃপণ ছিলেন! তিনি দুইটি মাত্র ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই পত্নীপ্রেমের ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুবিমল ভাবিয়া পাইল না ইহা কী করিয়া সম্ভব হইবে যে, তৃতীয় বর চাহিলে দশরথ বলিবেন, "না, তোমার পাওনা চুকিয়া গিয়াছে, আর আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাধ্য নই।" সে তো অরুণাকে অজস্র ও বিবিধ উপায়ে সন্তুষ্টি ও সুখ দান করিয়াও মনে করে না যথেষ্ট হইল। অরুণার মতো স্ত্রীর অভিলাষ নির্ব্বিচারে পূর্ণ করিয়া তবে না আনন্দ! সে অভিলাষ কি অঙ্গুলি গণিয়া পূর্ণ করিতে হইবে? এ কি ভৃত্যের বেতন, না, গয়লার পাওনা, যে বলিবে, 'এতদিন কাজ করিয়াছ, বা এত সের দুধ জোগাইয়াছ; তোমার হিসাবে এই পাওনা হইয়াছে, লও। ইহার কমও দিব না, কিন্তু ইহার বেশীও আশা করিও না।'

সুবিমল স্মিতমুখে সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে দশরথের অপেক্ষা, পৃথিবীর সকল পত্নীপ্রেমিক পতির অপেক্ষা, অধিক প্রেমপূর্ণ ভাবিয়া প্রগাঢ় আনন্দ ও গর্ব্ববোধ করিল।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে স্বামীর দরাজ মেজাজের (expansive mood) সংবাদ অরুণার জানা থাকিলে সে অনেক কিছু চাহিয়া লইতে পারিত। অন্ততঃ তাহার আশ্রিত দীনবন্ধুর আশঙ্কিত অন্নকষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়া

নিজের শান্তি অব্যাহত রাখিত। কিন্তু সে তাহার এই সম্ভাবিত সৌভাগ্যের কোন সংবাদ পাইল না, মাছ কোটাইবার তুচ্ছ কাজেই সে ব্যাপৃত রহিল। সুবিমলও স্ত্রীকে এ সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিল না, নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিল।

বাহিরে সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। সুবিমল কহিল, "কে ডাকে দেখ্ তো রে।"

মাছ রাখিয়া গোকুল উঠিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া জানাইল একটি লোক দেখা করিতে চায়।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কী রকম লোক? ভদ্দর-লোক?"

"না বাবু, এই আমাদের মতন গরীব মানুষ, বোধ হয় কিছু চায়-টায়।"

সুবিমল কহিল, "আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় এইখানেই। আর উঠতে পারি না।"

ভদ্রলোক নয় শুনিয়া অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে অরুণা সরিয়া যাইবার কোন কারণ দেখিল না। সে কলেজে পড়া মেয়ে, স্বামীর সহিত বাসে, ট্রামে ঘোরে, এবং ইচ্ছামত দ্রব্য পছন্দ করিয়া কিনিতে হইলে স্বামীর সহিত দোকানে গিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও নিজের বাড়ীতে অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে বাহির হইতে এখনও তাহার সংস্কারে বাধে। এবং সুবিমল আধুনিক কালের শিক্ষিত ও বহু বিষয়ে সংস্কারবিহীন হইলেও বৈঠকখানায় স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার বা নির্ব্বিশেষে সকল বন্ধুর সহিত আলাপ করাইয়া দিবার চেষ্টা বা ইচ্ছাও কখনো করে নাই। এ বিষয়ে অরুণার আচরণ এখনো অনেকখানিই তাহার মা-ঠাকুরমার আদর্শে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আর একটু বয়স হইলে, পুরাতন গৃহিণীদের মতই একখানি

গামছা পরিয়া ও আর একখানি গামছায় উর্দ্ধাঙ্গ আবৃত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান গুড়ওয়ালা ও পশ্চিমপ্রদেশীয় খোট্টা ডালওয়ালার সহিত দর করিয়া সওদা করিতে তাহার বাধিবে না ; দুর্দ্ধর্ষ-আকৃতি ঘুঁটিয়া-বিক্রেতাকে ধমক দিয়া এক পয়সায় চার গণ্ডার উপর এক গণ্ডা ফাউ আদায় করিতে সেও অবলীলাক্রমে প্রবল উদ্যম ও প্রখর কণ্ঠ নিয়োজিত করিবে। কারণ ইহারা ভদ্রলোক নয়। ইহাদের কাছে লজ্জা ও শালীনতা রক্ষার জন্য শাড়ীর নীচে সেমিজ ব্যবহার অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়, এমন কি গামছা দ্বারাই শাড়ীর কাজ যথেষ্ট চলিতে পারিবে !

এ সকল কথা আমি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছি না। এতদূর স্পর্দ্ধা আমার নাই। ইহা সুবিমলের কথা। আজিকার অরুণা উত্তরকালে কিরূপ অরুণায় দাঁড়াইবে তাহারই প্রসঙ্গে সুবিমল এই সব ভবিষ্যদ্বাণী করে। অরুণা হাসে ও প্রবল প্রতিবাদ জানাইতে প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে থাকে। কিন্তু বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরের প্রবীণা বঙ্গমহিলার অতি অদ্ভুত লজ্জাবোধ সম্বন্ধে স্বামীর অঙ্কিত চিত্র অস্বীকার করিতেও পারে না।

আগন্তুক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রকের উপর প্রায় মাথা ঠেকাইয়া গৃহস্বামীকে প্রণাম করিল। লোকটির বুদ্ধির অভাব নাই, মাথা তুলিয়া উঠানে সম্ভ্রান্ত নারীমূর্ত্তিকে দেখিয়া গৃহস্বামিনীকে চিনিয়া লইল। সেদিকেও সে একটী অতি-অবনত প্রণাম নিবেদন করিয়া দিল।

সুবিমল ও অরুণা দেখিল অতি সাধারণ-দর্শন, প্রায় মধ্য-বয়স্ক একটী অপরিচিত বঙ্গ বা উড়িয়া-সন্তান। দরিদ্র তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার প্রণাম সাঙ্গ হইলে সুবিমল প্রশ্ন করিল, "তোমাকে তো আমি চিন্‌তে পার্‌লুম না। কি চাই তোমার ?"

লোকটী সবিনয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমাকে চিন্‌বেন কী ক'রে বাবু। আমি তো পূর্ব্বে কখনো আপনার ছিচরণে আসি নি।"

সুবিমলের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সে তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল, "তা' তোমার কী চাই?"

আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে, বলি বাবু। অধীনের নাম শ্রীনিত্যহরি দাস ঘোষ। পিতার নাম ৺সত্যহরি দাস ঘোষ। নিবাস মেদিনীপুর জেলায়। কায়স্থের ছেলে বাবু। পেটের দায়ে এই হীন কর্ম্ম করতে হচ্ছে।"

নিত্যহরির দ্বারা ইতিমধ্যে কী হীন কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অবশ্য সুবিমলের জানা নাই। কিন্তু তাহার পৌরাণিকী পরিচয় দানের প্রথা দেখিয়া সুবিমলের সন্দেহ ছিল না যে, যথা সময়ে সকল সংবাদই বিনা চেষ্টায় অবগত হওয়া যাইবে। নিত্যহরিরা যে পাঠশালার লোক, সেখানে পরিচয় অর্থে নাম, ধাম, জাতি, পিতৃপরিচয়, পেশা এমন কি বেতন অবধি সবই বলিতে শেখানো হয়। সুতরাং সে সকৌতুহলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু নিত্যহরির বক্তৃতা হঠাৎ থামিয়া গেল।

অরুণার মন মাছের উপর হইতে সরিয়া নবাগতের কথাবার্ত্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইতিমধ্যে গোকুল ভৃত্য অন্য মাছ শেষ করিয়া রুই মাছে হাত লাগাইয়াছে। নিত্যহরি সেই দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার আত্মকথা ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঁহুঁ, ও কী করছ ভাই ও-রকম নয়, ও-রকম নয়।" বলিতে বলিতে সে দ্রুত গোকুলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়-চকিত গোকুলের হাত অচল হইয়া গেল, সে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে নিত্যহরির দিকে চাহিল। কিন্তু নিত্যহরি তাহাকে বুঝাই-বার চেষ্টা না করিয়া বলিল, "কিছু মনে কর না দাদা, দেখি একবার বঁটিটা।" এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াই বঁটির উপর

চাপিয়া বসিয়া মাছটি হাতে তুলিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে বিস্মিত কর্ত্তা, গৃহিণী ও ভৃত্যের বিস্ময় বর্দ্ধন করিয়া নিত্যহরি নিপুণহস্তে মাছের মুণ্ড ও দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পরে মাছের মুড়া হইতে পিত্তের থলি বাহির করিতে করিতে ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ওখান থেকে কাটলে কি মুড়োর বাহার থাকে ভাই? আহা হা, এমন সোনার মাছ, এর মুড়ো কি নষ্ট করবার জিনিষ। আর পিত্তি গলে গেলে আর কি মাছ মুখে করবার জো থাকতো?"

নিজের কাজে ও কথায় নিত্যহরি নিজেই বোধ করি সন্তোষলাভ করিয়াছিল। তাই মাছের মুণ্ডপাত করিয়াই তাহার বঁটী ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। মাছের দেহটিকে আর একটী বৃহৎ খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাবাবু, পটকা ফাটাঁবে।"

খোকাবাবুরা অবশ্যই পটকা ফাটাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অতএব তাহাদের উত্তরের জন্য অনাবশ্যক অপেক্ষা না করিয়া সত্যহরির কৃতীপুত্র মাছের পেটের ভিতর দুইটী আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া অবলীলা-ক্রমে একটী অক্ষত সুপুষ্ট পটকা টানিয়া বাহির করিয়া খোকাবাবুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

এতক্ষণে নিত্যহরির বোধকরি স্মরণ হইল যে সে এবাটীর বাবুর শ্রীচরণে আসিয়াছে মাছ কুটিতে নয়। সুতরাং যদি কুটিতেই হয় তবে অন্ততঃ একটা অনুমতি লওয়া সঙ্গত। সে মুখ তুলিয়া গৃহকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "মাছটা কুটিয়ে দেব মা?"

নিত্যহরি যদি তাহার প্রশ্ন গৃহিণীকে না করিয়া গৃহস্বামীকে করিত, তবে অনুমতি তাহার তখনই মিলিত। কারণ সুবিমলের মন

আজ সকালে বিশ্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়াই ছিল! এরকম প্রসন্নতা সকল মানুষের মনেই এক এক সময়ে আসিয়া থাকে। কিন্তু কেন আসে তাহার কোনও বলিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিতে গেলে প্রায় পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন এক একটা দিনে কী এক অজ্ঞাত কারণে মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, যখন কথা কহিতে গেলেই তাহাতে কলহের সুর বাজিয়া উঠে। আজ সকালে সুবিমলের সেই অকারণ চিত্ত প্রশান্তির সময়। ইহার ফলে সে নিত্যহরির কথায় ও কাজে একটা যেন কৌতুকের সন্ধান পাইয়াছিল এবং অপরিচিত গৃহস্থালীতে তাহার এই অনধিকার চর্চ্চায় বারন করিবার কথা মনে হয় নাই।

কিন্তু অরুণার চিত্তে আজই সেই বিশ্বব্যাপী অমূলক প্রসন্নতার পালা পড়ে নাই। সে কহিল, "না না, তোমাকে কুটতে হবে কেন, ও-ই কুটবেখ'ন। তুমি বাছা আবার কেন কষ্ট করতে গেলে? যাও, তুমি হাত ধুয়ে ফেল।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া উঠানের একধারে কলের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

নিত্যহরি বিনীত হাস্যে ঠোঁটের কোণ দুইটি প্রসারিত করিয়া বলিল, "এ আর কষ্ট কী মা? আমার পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যি ছিল তাই আজ সকালে লক্ষ্মী-নারায়ণের ছিচরণ দর্শন হ'ল। আপনাদের সেবা করতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!"

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া কল হইতে হাত ধুইয়া আসিল। সুবিমল কহিল, "তা, তুমি কি জন্যে এসেছ তা তো বল্লে না?"

নিত্যহরি পূর্ব্বে আত্মপরিচয় দিতেছিল দাঁড়াইয়া। এখন হয় তো নিজেকে এ বাড়ীর সঙ্গে অনেকটা পরিচিত বোধ করিয়া থাকিবে। হাত ধুইয়া আসিয়া রকের উপর উঠিয়া বসিল। তারপর ভিজা হাত

দুইটি ধীরে ধীরে পরস্পর ঘষিতে ঘষিতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, তাই বলতে গিয়েই উঠে গিয়েছিলাম বাবু, অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। মাছ ধরা আর বড় মাছ কোটা, এই দুটী আমার সখ আছে বাবু। আর আছে কেন, ছিলই বলি। এখন তো দুঃখের ধান্দায় সবই গিয়েছে। তবে নেহাৎ নাকি বাপ পিতেমোর অশীব্বাদ ছিল তাই আজ মহতের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। কায়স্থের ছেলে বাবু, মুখ্যু লোক বটে, তবে অ-আ ক-খটাও জানি আর আপনাদের ছিচরণের কৃপায় এ-বি-সি-ডিও এখনো ভুলিনি। কলকাতার সহরে পূর্ব্বেও এসেছি। রাস্তা ঘাট চিনি, দু-চার জায়গায় কাজও করেছি বাবু, কিন্তু খোসামোদ করতে পারি নি বলে চাকরী খোয়াতে হয়েছে। অদেষ্ট দোষে মনের মতন মনিব কোথাও পাই নি। মনিবকে ভক্তি ছেদ্দা করতে হয় এটুকু শিক্ষে আছে। কিন্তু মনিব, অন্নদাতা, পিতার সমান, দেখলে আপনি ভক্তি হবে, সে রকম মনিবও কপাল না ফিরলে তো হয় না। তাই তো বলছি বাবু, এত দিনে বোধ হয় বিধেতা পেরসন্ন হলেন।"

নিত্যহরির শুভাগমনের উদ্দেশ্য এতক্ষণে যেন কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইল। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্যও বটে, এবং এতক্ষণে তাহারও মনে হইল নিত্যহরি অতিরিক্ত কথা কহিতেছে, সে কারণেও বটে, সুবিমল তাহার আত্মকীর্ত্তনে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি কি আমার কাছে চাকরী করতে এসেছ না কি হে? আমার তো লোকের দরকার নেই, লোক আমার রয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ।"

বিনয়ী নিত্যহরি আরও বিনয়াবনত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, বাড়ীতে স্থান পাব ততদূর ভাগ্যি কি করেছি। আপিসের কাজে যদি কৃপা করে গেরণ করেন তাহলে জীবনটা ধন্য হয়।"

সুবিমল বিস্মিত হইয়া কহিল, "অফিসে ? ও, তুমি কি বেয়ারার কাজের জন্যে বলছ ?"

হাত দুইটী জোড় করিয়া নিত্যহরি কহিল, "আজ্ঞে।"

সুবিমল গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমাকে কে খবর দিলে যে আমার অফিসে বেয়ারার দরকার ?"

"আজ্ঞে, চাকরীর চেষ্টায় ধা-ধা করে বেড়াচ্চি, পাঁচ জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে খবর পেয়েছি বাবু। তা আমার তো মুরুবির কেউ নেই। থাকবে না কেন, খোসামোদ করতে পারলে মুরুব্বি জোগাড় করতে পারি, কিন্তু খোসামোদ করতে তো শিখিনি বাবু, যাকে দেখলে ভক্তি হয় তাকে প্রাণ দিয়ে—"

সুবিমল কহিল, "তুমি—মানে তোমার বাড়ী উড়িষ্যায় ?"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া নিত্যহরি বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, আমি উড়ে নই। আমি বাঙ্গালী, মেদিনীপুরে বাড়ী আমার।"

সুবিমল কহিল, "ও হাঁ৷ হাঁ৷, তুমি বলেছ বটে।"

বুদ্ধিমান নিত্যহরির মনে হইল বাবু যে ভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন, তাহাতে সে তাঁহার কৃপা হইতে একেবারে বঞ্চিত নাও হইতে পারে। অতএব সে মুখখানি করুণ করিয়া হাত দুইটি পুনরায় জোড় করিয়া বলিল, "উড়ে হলে কি আর ভাবনা ছিল, বাবু ? না এতদিন বসে থাকতে হত ? সব আপিসেই উড়ে ব্যায়রা আর খোট্টা চাপরাশী। আমাদের মতন গরীব বাঙ্গালীর আর কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা মেলে না বাবু।" বলিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখভাব আরও অসহায় ও করুণ করিবার প্রয়াস পাইল।

আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সুবিমলের পড়া ছিল, তাহা ছাড়া সে নিজেও দেশের জন্য চিন্তা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী যে সর্ব্বত্রই বেদখল হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার প্রতিবিধান করা যে একান্তই জরুরী প্রয়োজন, এ কথা তাহার ভাবুকচিত্তে প্রায়ই উদয় হয়।

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হুঁ। তুমি অন্য জায়গায় কাজ করেছিলে বলছিলে না? সে সব সার্টিফিকেট আছে?"

তখন নিত্যহরি পরমোৎসাহে তাহার জামার পকেট হইতে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো একটী লেপাফা বাহির করিল এবং আবরণ মুক্ত করিয়া লেপাফাখানি অতি ভক্তিভরে বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

অতঃপর আরও কয়েক মিনিট বাবুর সহিত নিত্যহরির সওয়াল-জবাব চলিবার পর, সোমবারে অফিসে দেখা করিবার আদেশ লাভ করিয়া নিত্যহরি বিদায় চাহিল। অবশ্য বিদায় চাহিবার পূর্ব্বে বাবুর শ্রীচরণে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিতে ভোলে নাই এবং মা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমলকেও অবজ্ঞা করিল না। বিদায় কিন্তু তাহার তখনই মিলিল না। মাঠাকুরাণী বোধ করি তাহার মাছ কোটার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু মিষ্টান্ন জলযোগ করিতে দিলেন। উপরের বারান্দায় বসিয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে সুবিমল শুনিল জলযোগরত নিত্যহরি অরুণাকে জানাইতেছে যে পরমেশ্বর যখন তাহাকে মহতের আশ্রয়েই আনিয়া ফেলিয়াছেন, তখন প্রাণ দিয়াও সে অন্নদাতা পিতার—এবং অন্নপূর্ণা মাতারও—সন্তুষ্টি সাধন করিবেই। কারণ সে কর্ত্তব্য সাধন করিতেই শিখিয়াছে, কাজে ফাঁকি দিয়া তোষামোদ করিয়া মনস্তুষ্টি করিতে সে পারেও না, আর তাহার পিতৃ-পিতামহের পুণ্যফলে তাহার মনিবও সে রকম নহেন।

হৃষ্টমনে নিত্যহরি প্রস্থান করিল। কর্ত্তা ও গৃহিণীর সদয় ব্যবহারে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, সোমবারে অফিসে দেখা করিতে গেলেই তাহার অঙ্গে অমুক কোম্পানীর চাপকান ও তকমা শোভা পাইবে।

পাঁচ

দীনবন্ধু-বৎসল অরুণার সুযোগ আসিল এই নিত্যহরিকেই উপলক্ষ্য করিয়া। আহারে বসিয়া সুবিমল কথাটা পাড়িল। মাছের নানাবিধ ব্যঞ্জনে রসনা পরিতৃপ্ত হইবার সময়ে মাছের প্রশংসা এক দফা হইল এবং তাহা হইতে যে ব্যক্তি মাছ কুটিয়াছে তাহার কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক।

সুবিমল কহিল, "লোকটা কাজের লোক আছে, কয়েক জায়গায় কাজও করেছে, তুমি কী বল ?"

প্রশ্নের বিষয়বস্তুটা অরুণা বুঝিল। কিন্তু না বুঝিবার ভান করিয়া কহিল, "হুঁ, মাছটাছ কুটতে জানে।"

"মাছ কোটার কথা বলছি না, অফিসের কাজের কথা বলছি। বলছি বুদ্ধি সুদ্ধি আছে, কাজ চালাতে পারবে, কী বল ?"

দীনবন্ধু-সমস্যা না থাকিলে অরুণার নিত্যহরি সম্বন্ধে স্বামীর মতে সায় দিতে কোনও আপত্তিই থাকিত না। কারণ ওবিষয়ে তাহার নিজের কোনও মতামতই থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এখন নিত্যহরিকে দীনবন্ধুর সিংহাসনের দাবীদাররূপে দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অরুণার মত স্থির হইয়া গেল। সে গম্ভীর ভাবে কহিল, "আপিসের কাজ চালাতে পারবে কি না পারবে, সে তুমি বোঝো, আমি কি করে বলব ?

তবে আপিসে তোমার সময় কাটাবার জন্যে আর ভাবতে হবে না, এটুকু বলতে পারি।”

সুবিমল ঠিক বুঝিতে পারিল না অরুণার কথা কোনদিকে মোড় ফিরিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, “তার মানে?”

এবার অরুণা কথায় একটু জোর দিয়া বলিল, “মানে আর কী? মাছের মুড়ো কাটা ছাড়া আর কিছু কাজের পরিচয় তো এখনও পাই নি। তবে তোমার নিত্যহরি যে কথা কইতে জানে এটা বুঝতে আমার মতো বোকা লোকেরও দেরী হয় নি। অত কথা কয় যে লোক তাকে আমার তো বাপু ভালো লাগে না, তা তুমি যা-ই বল।”

নিত্যহরির এ অপবাদ অস্বীকার করা গেল না, সুতরাং তাহার অপরিমিত বচন-বিলাসের জন্য সুবিমলই লজ্জিত হইল এবং তাহার এই দোষ চাপা দিবার উপযুক্ত একটা পাল্টা গুণ হিসাবেই সে বলিল, “কিন্তু লোকটা বাঙ্গালী, তা বল?”

অরুণা বলিল, “হুঁ”।

“কী বললে শুনলে তো? আজ কাল উড়ে আর মেড়োদের জন্তে বাঙ্গালীদের আর করে খাবার রাস্তা নেই। সব অফিসেই সর্দ্দার বেয়ারা উড়ে, আর চাপরাসী-পিওনদের জমাদার খোট্টা। তাহলে এইসব অশিক্ষিত বাঙ্গালীরা যায় কোথা বল? এই ধরো নিত্যহরির মতো পাড়াগেঁয়ে গরীব লোক, যাদের মুরুব্বির জোর নেই, এরা—”

অরুণা কহিল, “তা তোমার নিত্যহরির অন্ততঃ মুরুব্বির অভাব হবার কথা নয়। ওরকম খোসামোদ করলে লাট সাহেবকে মুরুব্বি করে আনতে ওর বেশী দেরী হবে না। আর অত কথায় কাজ কী, তোমারই যখন মন গলিয়েছে।”

সুবিমল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "তার মানে? তুমি কি বলতে চাও ও আমাকে খোসামোদ করে ভিজিয়েছে?"

অরুণা উত্তর দিল না। তাহাতে তাহার উত্তর অস্পষ্ট রহিল না। সুবিমল বলিল, "না, চুপ করে থাকলে চলবে না অরুণা, তুমি বড় ভয়ানক কথা বলেছ। এ কথা বলবার মানে কী বল?"

"মানে কিছু নয়, তুমি খেয়ে নাও। আর দুটো মাছ ভাজা দি, কী বল?"

সুবিমল কহিল, "রেখে দাও তোমার মাছ ভাজা, তোমার ও কথা বলবার মানে কী আগে বল।"

তখন অরুণা যথাসাধ্য সহজসুরে বলিল, "মানে আর আমি কী বলব? ছিচরণ, মহতের আশ্রয়, মনের মত মনিব, তারপর তোমার লক্ষ্মীনারায়ণ, এই সব কথাগুলোর মানে তুমিও জানো। আর মাছ কুটে দেওয়ার মানে বোঝাও শক্ত নয়।"

"হুঁ, ওসব কথা সে বলেছিল বটে। কিন্তু ওগুলো আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে মাত্র। ঐ রকম কথায় আমাকে influence করতে পারে, তুমি আমাকে এমনি হালকা মনে কর? লোকটা বাঙ্গালী, কাজ চালাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে, তাই। তবু ওকে তো বলিনি যে ওকেই চাকরী দোব।"

স্বামীর মনে ব্যথা দেওয়া অরুণার ইচ্ছা নয়। সে কহিল "তুমি রাগ কোরো না, কিন্তু ওকে না বললেও, তোমার মনটা ওর ওপর সদয় হয়েছে কি না বল? সে কি খালি ও বাঙ্গালী বলেই?"

অরুণার সহজ সুরে সুবিমলের সুর নামিল না। বলিল, "তা না তো কি ওর খোসামোদে ওর ওপর সদয় হয়েছি? আমাকে খোসামোদ

করতে এলে ওর চাকরী একদিনও টি`কবে ? তুমি আমাকে এতদিনে এই চিনলে ?”

“তোমাকে চিনেছি বলেই তো বলছি। ও না টেঁকে আর একটা বেয়ারার বরাত খুলবে। কিন্তু সেও কদিনের জন্যে তা আমি বলে দিতে পারি। তা হলে আর বেচারা দীনবন্ধুকে মিথ্যে কাঁদানো কেন ?”

সুবিমলের ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হইল, বলিল, “কী আশ্চর্য্য ! দীনবন্ধু নিজের দোষে তার চাকরী খোয়াচ্ছে, তাকে অনেকবার সাবধান করা হয়েছে, কিন্তু—”

তর্কে যোগদান করিয়াও তার্কিক মেজাজের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া থাকা বেশীক্ষণ সম্ভব নহে। অরুণার সুর আর নিস্পৃহ সহজ রহিল না। সে বাধা দিয়া কহিল, “দোষ তো তার খোসামোদ করা ? সে দোষে যদি দীনবন্ধুর চাকরি যায়, তাহলে তোমার ঐ নরহরির—”

“নরহরি নয়, নিত্যহরি।”

“নিত্যহরির চাকরি পাবার আগেই যাওয়া উচিত। তোমার নিত্য-হরির কাছে দীনবন্ধু এখনও পাঁচ-বছর খোসামোদের শিক্ষা নিতে পারে।”

কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার মতো নয় বলিয়াই মনে হয় যেন। তাই তাহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় সুবিমল হঠাৎ যুক্তি-তর্কের রাশ ছিঁড়িয়া ফেলিল। অনাবশ্যক উচ্চ কণ্ঠে বলিল, “আমি তোমার দীনবন্ধুকে রাখব না, আমার খুশী। ব্যস।”

সহজেই জ্বলিয়া উঠে ও সহজেই নিবিয়া যায়, এমন দাহ্য পদার্থ পৃথিবীতে একাধিক আছে। ইহাদের যে কোনও একটির উল্লেখ, করিয়া দাম্পত্য কলহের সহিত উপমিত করিতে পারা যায়। কিন্তু সে উপমা বা কোনও উপমার সাহায্যেই দাম্পত্য কলহের অজ্ঞেয় রহস্যের পরিমাপ

করা যায় না। কোনও পক্ষেই ভালবাসার প্রাবল্যে বিন্দুমাত্র মন্দা পড়ে নাই, উভয় পক্ষের মনেই মালিন্যের নামগন্ধ নাই। অথচ ক্ষণে ক্ষণে মনোমালিন্য ঘটিতে পাঁচ মিনিটও লাগে না এবং তাহার কারণও যেমন অনাবশ্যক তেমনই লঘু। এই রহস্য-কৌতুকময় দুর্ঘটনা মানুষের ইতিহাসের শুরু হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আজও ইহার পুনরাবৃত্তি হইয়া গেল এই প্রণয়ী যুগলের মধ্যে।

সুবিমল সজোরে বলিল, “ব্যস।” কিন্তু একপক্ষ ‘ব্যস’ বলিলেই অপরপক্ষ তাহা মানিয়া লইয়া নিরুত্তর হইবে, তর্ক-যুদ্ধের নিবৃত্তি অত সহজ নয়। অরুণা পাল্লা দিয়া স্বামীর সহিত কণ্ঠ না চড়াইলেও এবার যে সুরে কথা কহিল তাহা আর কোমল রহিল না।

“ব্যস তা আমি জানি, আর তোমারই যে খুশী তাও জানি। দীনবন্ধুকে চাকরি থেকে ছাড়ানো তোমার খুশী, আর নিত্যহরিকে চাকরি দেওয়া সে-ও তোমার খুশী। কিন্তু এর পর আর যেন বোলো না তুমি খোসামোদ পছন্দ কর না। নিত্যহরি বাঙ্গালী বলেই যে তোমার দয়া পেয়েছে এ কৈফিয়ৎ দিয়েও আর নিজেকে ঠকিও না।”

মৃদুভাষিণী অরুণার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে বক্তৃতা-বাগীশ সুবিমলের সন্দেহ হইল যেন সে-ই পিছু হটিতেছে। চীৎকারে জিতিবার সম্ভাবনা আর নাই, যুক্তি দিয়া মান রক্ষা করিবার সময়ও চলিয়া গিয়াছে। সুবিমল কয়েক মুহূর্ত গুম্ হইয়া থাকিয়া সুর নামাইয়া প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, আমার অফিসের বেয়ারা রাখা না রাখা সম্বন্ধে তোমার মাথা ব্যথা কেন বল তো? তাকে যে নোটিস দিয়েছি, অবশ্য মুখের নোটিস, তা' ফিরিয়ে নিই এই তোমার ইচ্ছে, কেমন?”

অরুণার মনে হইল এই পরম সুযোগ। সে তর্ক ভুলিয়া সাগ্রহে

বলিল, "হ্যাঁ, সত্যি তাই আমার ইচ্ছে। দেখ, লোকটা আমাকে বড্ড কাকুতি-মিনতি করে ধরেছে,—আহা গরীব লোক—"

স্থবিমল কহিল, "হুঁ! আচ্ছা তুমি তাকে বলতে পার—" বলিতে বলিতে সে জলের গ্লাস মুখে তুলিল। আশান্বিত হৃদয়ে অরুণা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। স্থবিমল গ্লাস নামাইয়া অভ্যাসমত তাহার ভিতর হাত ডুবাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তাকে বলতে পার—যে বৃথা আশা করে লাভ নেই। সে আমি পারব না, এমন কি তুমি বল্লেও না। কিছু মনে কোরো না অরুণা, তোমার ইচ্ছে আমি রাখতে পারলুম না।"

স্বামীর নির্ম্মমতায় ও ভুল আশা করিবার লজ্জায় অরুণার মুখ কালো হইয়া গেল। এবং এত সহজে অরুণাকে পরাজিত করিয়া দশরথ-বিজয়ী পত্নী-প্রেমিক স্থবিমল হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু বলবার নেই বোধ হয় তোমার।"

অরুণা ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা বলবার ছিল। তা থাক।"

স্থবিমল বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইয়া ছিল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পরম ঔদার্য্যের সহিত উৎসাহিত করিল, "বল। বল না?"

"অনেকদিন আগে পড়েছিলুম, কোন বইখানা তা' ভুলে গেছি, তোমার মনে থাকতেও পারে, পুরাকালে ইয়োরোপে কে একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন, তাঁর নামে সেক্সপিয়ার একখানা নাটক লিখেছেন,—সেই সম্রাট না কি গর্ব্ব করতেন তিনি কখনও খোসামোদের বশ হন না। তাঁর সম্বন্ধে সেক্সপিয়ার কী যেন বলেছেন আমার মনে নেই। তোমার কাছে সময়মত একবার শুনব সেই গল্পটা। আর ইংরিজিতে একটা

প্রবাদ আছে 'Robbing Peter to pay Paul,' এটার মানেটা যদি সময় পাও আমাকে একটু বুঝিয়ে দিও তো।"

জলদ-গম্ভীর স্বরে একটা 'আচ্ছা' বলিয়া সুবিমল বাহির হইয়া গেল।

শুক্রবারও বৃথায় গেল।

ছয়

বৃদ্ধ প্রফুল্লবাবু বৃহৎ লেজার মিলাইয়া যখন উঠিলেন, তখন শনিবারের অফিসে বেলা অনেক হইয়াছে, তিনটা বাজিবার আর বেশী দেরী নাই। খাতাপত্র যথারীতি চাবিবন্ধ করিয়া প্রফুল্লবাবু চাদর ও ছাতি লইয়া বড়বাবুর টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "রেখে দিন না মশাই, ক-টা বাজলো তা খেয়াল আছে। উঠুন উঠুন, শনিবারে এত বেলা পর্য্যন্ত কিসের এত কাজ?"

বড়বাবু বিরাট একটি ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বোধকরি ফাইলের অন্তর্গত বিষয়ে তন্ময় হইয়া ছিল। প্রফুল্লবাবুর কথায় তাহার যেন ঘুম ভাঙ্গিল। বলিল, "হ্যাঁ, এই যে উঠি।" হাতের ফাইলটা দেখাইয়া বলিল, "এই এদের ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী যে করা যায়, তাই ভাবছি। সাহেব যাবার সময় বলে গেল ফাইলটা একবার ভালো করে পড়ে রাখতে।"

প্রফুল্লবাবু কহিলেন, "ও হবে হবে, সোমবারে যা-হয় করবেন'খন। কাদের ব্যাপার? সেই পিটার মার্কস-এর কন্ট্রাক্ট নিয়ে বুঝি?"

"না সেটা নয়। এটা সেই যে ইয়েদের,—ঐ যে কি বলে—ইয়ে—"

যে ফাইল লইয়া তাহার একাগ্র একঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া

গেল, সুবিমল দেখিল তাহার বিষয়বস্তু দূরের কথা অপর পক্ষের নামটা পর্য্যন্ত তাহার মনে পড়িতেছে না।

তাহার মনে হইল প্রফুল্লবাবু সব ধরিয়া ফেলিয়াছেন। অফিসে বসিয়া, চোখের সামনে ফাইল ধরিয়া সে যে এতক্ষণ নিজের গৃহেই ঘুরিতেছিল, ইহা সে এতক্ষণ নিজে না জানিলেও বুড়া প্রফুল্লবাবুর কি আর বুঝিতে বাকী রহিল। অনাবশ্যক ও অর্থহীন কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, "মানে, বড্ড মাথাটা ধরেছে কি না।"

"মাথা ধরার আর অপরাধ কী বলুন? দশটায় এসে বসেছেন, আর এই তিনটে বাজল, সেই যে ঘাড় গুঁজে লেগেছেন,—দেখছি তো। নিন উঠুন, ফাইল বন্ধ করে মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ুন দিকি, বাইরের হাওয়ায় মাথাটা ছেড়ে যাবে। এত খাটলে বাঁচবেন কী করে?"

সুশীল সুবোধ বালকের মতো সুবিমল উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতে গেল। প্রফুল্লবাবুর কথা ঠেলা উচিত নয়। প্রফুল্লবাবুর অপেক্ষা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী সংসারে আর কেহ আছেন বলিয়া মনে পড়িল না। আত্মীয় বল, বন্ধু বল, সকলেই কিছু না কিছু স্বার্থ মিশাইয়া তাহার সহিত স্নেহ-মমতার আদান-প্রদান করে। কিন্তু এই প্রফুল্লবাবু, শুধু আজ বলিয়া নহে, চিরকালই তাহাকে অকারণ ও আন্তরিক স্নেহ দিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীতে এখনও প্রকৃত স্নেহ-ভালবাসার একান্ত অভাব হয় নাই এবং প্রফুল্লবাবুর ন্যায় স্বার্থহীন, অবিমিশ্র ভাল লোক এখনও অপ্রাপ্য নয়।

বাথরুম হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুবিমল দেখিল, দীনবন্ধু তাহার টেবিল গুছাইয়া চাবি বন্ধ করিতেছে। সে কোট পরিয়া ছাতি হাতে লইতে দীনবন্ধু তাহার হাতে চাবির রিং দিয়া যুক্তকরে বড়বাবুকে ও একাউণ্ট বাবুকে দণ্ডবৎ করিল।

দীনবন্ধুর ব্যবহারে এই কয়েকদিন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহা যে সুবিমল লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহার মুখের এ ভাব পূর্ব্বে চোখে পড়িয়াছে কি না মনে পড়ে না। আজ মনে হইল দীনবন্ধুর মুখখানা যেন বড় করুণ, বড় কাতর।

পথে আসিয়া সুবিমল হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "প্রফুল্লবাবু, আপনি 'জুলিয়াস্ সিজার' পড়েছেন নিশ্চয় ?"

প্রফুল্লবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন 'জুলিয়াস্ সিজার ? তা, কি জানি, হয় তো পড়ে থাকব, বাল্যকালে ইস্কুলে-টিস্কুলে।"

"না না, ইস্কুলে পড়ার কথা নয়। সেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস্ সিজার' নাটকের কথা বলছি। কলেজে বোধহয় পড়ে থাকবেন।"

প্রফুল্লবাবু কুণ্ঠিত ও বিব্রত সুরে বলিলেন, "কলেজে পড়া ? সেক্সপিয়ারের ? তা—সে,—কি জানি,—তা কেন বলুন তো ?"

অকস্মাৎ সুবিমলের খেয়াল হইল, প্রফুল্লবাবু হয় তো কলেজের পড়া নাও পড়িয়া থাকিতে পারেন। বৃদ্ধের হিসাব রক্ষার জ্ঞান সর্ব্ব-বিদিত, কিন্তু তাঁহার সাধারণ শিক্ষার পরিমাণ সম্বন্ধে কে-ই বা খবর রাখে। অপ্রস্তুত হইয়া সুবিমল বলিল, "না না, সে এমন কিছু নয়। এমনি একটা কথা মনে পড়ল। কোথায় যেন পড়েছিলুম, ঐ জুলিয়াস্ সিজার নাটকেই বোধ হয়, সিজার খোসামোদকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই প্রফুল্লবাবু মন্তব্য করিলেন, "ঠিক আপনার মতন। হাঃ হাঃ।"

এ মন্তব্যের উত্তর না দিয়া সুবিমল বলিতে লাগিল, "সিজারের বড় অহঙ্কার ছিল যে, খোসামোদে কেউ তাঁকে টলাতে পারে না! কিন্তু তাঁকেও খোসামোদ করবার মতো বুদ্ধিমান লোক ছিল। সে খোসামোদের

মন্ত্র ছিল 'সিজারকে খোসামোদে টলানো যায় না।' এই কটি কথার মিষ্টত্বে জুলিয়াস্ সিজার এতই টলতেন যে তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেও এই খোসামোদের সূক্ষ্ম রূপটি ধরা পড়ত না। 'Ceaser was best flattered—"

প্রফুল্লবাবুর একাগ্র লক্ষ্য ছিল পথের সুদূর প্রান্তে। তাঁহার গৃহমুখী যে ট্রাম, তাহারই প্রতীক্ষায় তিনি দূরে চাহিয়া 'হুঁ, হাঁ' দিয়া বুড়া বয়সে ঐতিহাসিক সাহিত্যের পাঠ লইতে ছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার ট্রাম আসিয়া পড়িল। তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আচ্ছা সুবিমল বাবু, সোমবারে বাকিটা শুনব'খন, ভারি চমৎকার গল্প, আচ্ছা চলি, নমস্কার।" বলিতে বলিতে ছাতাধারী হাত কপালের কাছে উঠাইয়া প্রফুল্লবাবু দ্রুতপদে ট্রামের দিকে আগাইয়া গেলেন। সুবিমল সিজারের গল্প থামাইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পিছনে একটা প্রতিনমস্কার করিল।

সাত

একলা চলিতে চলিতে আবার প্রফুল্লবাবুর স্নেহের কথাই সুবিমলের মন জুড়িয়া রহিল এবং শোকসভায় মৃতব্যক্তির গুণরাশির মতো প্রফুল্লবাবুর সদ্গুণ অপরিমেয় হইয়া উঠিল।

কী সজ্জন ও কী সহৃদয়! তাহাকে অতিশ্রমে ক্লান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লবাবুর অনুযোগ তো লোক দেখানো ভদ্রতা নয়। তাহাতে যে অন্তরের উদ্বেগ ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। আর সত্যই তো। মিথ্যা উদ্বেগের ভান করিবার তাঁহার প্রয়োজনই বা কী? বড়বাবু অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যকাল এ অফিসে ঢের বেশী এবং বড়বাবুর অধীনও

তিনি নহেন। তাঁহার বিভাগে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। অতএব বড়বাবুর খোসামোদ করিয়া বা মন রাখিয়া কথা কহিবার প্রফুল্লবাবুর কোন কারণ নাই, আবশ্যকও নাই। সে সকল করিবে ছোট কেরাণী ও দীনবন্ধুর দল।

দীনবন্ধুর মুখটা আজ অতি বিষণ্ণ দেখাইল বটে, তা' আজই যখন তাহার চাকরীর শেষ দিন, তখন মুখ বিষণ্ণ না হইয়া কি অট্টহাস্যময় হইবে? চাকরী তাহার শীঘ্রই জুটিয়া যাইবে। তবে ভাগ্য মন্দ হইলে জুটিতে দেরী হইয়াও বিচিত্র নয়। অন্ততঃ সম্প্রতি কিছুদিন দীনবন্ধুর চমৎকারা অন্নচিন্তার দুর্দ্দিন আসিল বটে। কিন্তু কী করা যাইবে। তাই বলিয়া ও-রকম অতিভক্তি দিনের পর দিন সহ্য করা যায় না, যতই কেন দীনবন্ধু কাযের লোক হোক না।

অতিভক্তির রোগ নিত্যহরিটারও কিছু কম নয়। কম কেন বরং দীনবন্ধুর চেয়ে বেশীই হইবে। দীনবন্ধু অন্ততঃ বড়বাবুকে দেবতা বানাইবার দুশ্চেষ্টা কখনও করে নাই। আর ঐ নিত্যহরিটা তো একেবারে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অরুণাকে ও তাহাকে লক্ষ্মীনারায়ণের পদে বহাল করিয়া দিল। করিলেই কি সে মনে করিয়াছে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তাহা হইলে আর বেচারী দীনবন্ধুর চাকরী যাইবে কেন?

এই রকমের কথা কাল অরুণাও যেন বলিয়াছিল। সুবিমল স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল অরুণা আর কী কী বলিয়াছিল। সকল কথা মনে নাই, তবে অরুণার শেষ উক্তি, বা শ্লেষ উক্তি বলা যায়, একেবারেই বাজে। পিটারের পকেট মারিয়া পলকে দান করার কথা এখানে একেবারেই খাটে না। বাঙ্গালীকে চাকরী দিবার জন্যই কিছু উড়িয়াকে পদচ্যুত করা হইতেছে না। দীনবন্ধুর চাকরী আগে গিয়াছে, তারপর নিত্যহরির কথা আসিতেছে। তবে যদি বল দীনবন্ধুর চাকরী এখনও যায় নাই,

বড়বাবু একটু অনুগ্রহ করিলেই তাহা টিঁকিয়া যায়, সে কথা আলাদা। কিন্তু দীনবন্ধুর—চুলায় যাউক দীনবন্ধু, আর চুলায় যাউক নিত্যহরি। ওরা দুইটাই সমান। ঐ বেটাদের জন্যই তো গৃহে শান্তি নাই। কাল হইতে অরুণার মুখের আলো নিবিয়া গিয়াছে।

এবং তাহার নিজের মুখেও যে একটা বিশ্রী গাম্ভীর্য্য নামিয়াছে তাহা নিজের চোখে না পড়িলেও সুবিমলের বুঝিতে বাকী নাই। অবশ্য অরুণার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে এত তুচ্ছ কারণে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, অথবা তুমুল বাক্যালাপ করিয়া নিজের রাগের বিজ্ঞাপন জাহির করে নাই। তাহা করিলে আর সাধারণ মেয়েদের সহিত তাহার প্রভেদ রহিল কোথায়। অরুণা সংসারের কাজও করিতেছে ঠিকমতো, সুবিমলের কাজের দিক হইতেও দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেই কি সব হইল? ইহা কি অরুণা বোঝে না যে, ভাত ডাল রান্নাই সংসার নহে, প্রয়োজনীয় কথা কহাই কথা কহা নয়? বোঝে সবই। বোঝে বলিয়াই তো তাহার এই অত্যাচার। মনটি তাহার লোহার সিন্ধুকে চাবি দিয়া রাখিয়াছে, কথাগুলা বাহির করিতেছে যেন বরফের বাক্স হইতে। সংসারের সকল আলোর সুইচ তাহার হাতে তাহা জানে বলিয়াই অরুণা আলো নিবাইয়া দিয়া তাহার উপর এই অত্যাচার করিতেছে। দীনবন্ধুর চাকরী থাকুক আর না থাকুক তাহাতে অরুণার কী আসে যায়? এই তুচ্ছ কারণে কাল সুবিমলকে চটাইয়া দিবার তাহার কী প্রয়োজন ছিল? দীনবন্ধুকে যদি এবারটা মার্জ্জনাই করা যায় তাহা হইলেই কি অরুণা রাজা হইয়া যাইবে?

"বাবু গাড়ী লিবেন নাকি?"

পথের ধারে রিক্সা গাড়ীর আড্ডা। বোধ করি অন্যমনস্ক সুবিমল

ইহাদের কাহারও দিকে দুই এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া ছিল। আশান্বিত রিক্সাওয়ালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিল, "বাবু গাড়ী লিবেন নাকি ?"

অন্যমনস্ক সুবিমলের উত্তর না পাইয়া আরও দুই তিনজন রিক্সাওয়ালা ডাকিল, "আইয়ে না বাবু, আইয়ে।" "কাহাঁ যানে হোগা চলিয়ে।"

"গাড়ী নেহি মাংতা" বলিয়া সুবিমল অগ্রসর হইল। কিন্তু দুই চারি পা গিয়া তাহার হঠাৎ নিজেকে অতিশয় ক্লান্ত বোধ হইল। মনে হইল পথ চলিবার উপযুক্ত বল আর তাহার নাই। ফিরিয়া আসিয়া হাতের কাছে যে রিক্সাটা পাইল, তাহাতে চড়িয়া বসিয়া চলিতে হুকুম দিল।

যোয়ান রিক্সাওয়ালা ভালো ভাড়া আদায় করিবার লোভে ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গৃহ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এতক্ষণে সুবিমলের খেয়াল হইল কী ভুল সে করিয়াছে। মিথ্যা পয়সা খরচ করিয়া গাড়ী চড়িয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া লাভ কী ? শনিবারের দীর্ঘ অপরাহ্ন কাটিবে কা করিয়া ? অফিসের কাপড় চোপড় বদলাইতে, হাত মুখ ধুইতে ও জলযোগ সারিতে খুব বেশী সময় লাগে তো আধঘণ্টা। তাহার পর মুখ বুজিয়া নিঃসঙ্গ ইজি-চেয়ারের কণ্টক শয্যায় পড়িয়া সিগারেট টানিতে এমন কী ভাল লাগিবে যাহার আকর্ষণে সে রিক্সা চড়িয়া বসিল।

আবার বরাতক্রমে রিক্সাটাও জুটিয়াছে এমন বেয়াড়া, যে স্বভাবসিদ্ধ অলস গতি ভুলিয়া যেন রেসের বাজি মারিতে ছুটিয়াছে! ছুটিয়াছে তো ছুটিয়াছেই, তাহার আর কমিবার লক্ষণ ত নাই-ই, বরং হতভাগা রিক্সাওয়ালাটার গতি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অনেক দূর হইতে সুবিমলের বাড়ী দেখা যায়। দূর হইতে সেই দিকে চাহিয়া ঘরের ভিতরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার স্মরণ করিয়া সুবিমলের মুখের মেঘ আরও ঘনীভূত হইল।

শয়ন-গৃহের জানালা এবং দূরের বড় রাস্তা, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি থাকিলেও বাধা কিছু ছিল না। অতিপরিচিত ও অতিপ্রিয় ব্যক্তির অবয়বের আভাসই চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট। জানালা দিয়া দূরে বাহিরে চাহিয়া অরুণা চমকিয়া উঠিল। আপিস হইতে বাড়ী আসিতে রিক্‌সা চড়িবার প্রয়োজন হইল কেন? থার্ম্মোমিটার তো কাল দুপুর হইতেই চড়িয়া আছে। কিন্তু সে তো মনের জ্বরের নোটিস। এখন কি আবার শরীরও অসুস্থ হইল? উদ্বিগ্ন অরুণার তখনই মনে পড়িল সকালে সুবিমল নামমাত্র আহার করিয়াছে, যেমন ভাত বাড়িয়া দিয়াছিল তেমনই পড়িয়াছিল। অরুণা দেখিয়াও দেখে নাই, অল্প আহারের জন্য অনুযোগ বা বেশী আহারের জন্য অনুরোধ কোনটাই করে নাই। কিন্তু এই কম খাওয়ার যে এ অর্থ হইতে পারে তাহা তখন একবারও মনে হয় নাই। এখন স্মরণ হইল বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে যখন ভাতে রুচি থাকে না তখন বুঝিতে হইবে দেহের অসুস্থতা আসন্ন। আজ আপিসে না যাইতে দিলেই হইত। শঙ্কিতা অরুণা রিক্‌সার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু রিক্‌সাওয়ালাটা কী হতভাগা গো। তাহার যেন ইচ্ছা নয় সামনের দিকে অগ্রসর হয়। দূর হইতে দেখিলেও লোকটাকে তো যোয়ান বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পা দুইটা উহার অত দুর্ব্বল কেন? রিকসা টানিতে আসিয়াছে আর ছুটিতে জানে না? নীচে আসিয়া উঠানের ধারে রকে বসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে করিতে অরুণা মন্দগতি রিক্‌সাওয়ালার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

মজুরী ষোল আনা লইবে কিন্তু কাজের বেলা আট আনা ফাঁকি মিশাইয়া সারিবে, এই দুর্ম্মতির জন্যই তো আজকাল মানুষের দুঃখ-কষ্ট এত বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী কত বড় কথাই বলিয়া গিয়াছেন—"চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজই সম্পন্ন হয় না।" শুধু মহৎ কাজ কেন, চালাকি দ্বারা কোন্ কাজই বা সুসম্পন্ন হয়? ঐ নিত্যহরি লোকটা কাল কী ভক্তি, কী কার্য্যতৎপরতা ও কী ভালমানুষির অভিনয়ই করিয়া গেল। কী তাহার বাক্‌পটুতা। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, অতখানি বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও সুবিমলের চোখে এই লোকটার চালাকি ধরা পড়িল না? হয় তো এই নিত্যহরিই দীনবন্ধুর পদে নিযুক্ত হইবে।

হয় আর কী করা যাইবে? দীনবন্ধুর অদৃষ্ট। নিত্যহরিরও অদৃষ্ট। নিত্যহরির অদৃষ্টে যাহা লাভ করিবার আছে তাহা সে লাভ করিবেই। আর দীনবন্ধুর অদৃষ্টে যে ক্ষতি লেখা আছে তাহাও রোধ করা কাহারও সাধ্য নয়। তবে অরুণা আর কী করিবে? সামান্য দীনবন্ধু, যে তাহার জাতিও নয় জ্ঞাতিও নয়, তাহারই জন্য সে স্বামীর সঙ্গে কলহ পর্য্যন্ত করিয়াছে। আবার কী করিতে পারে সে? এখন দীনবন্ধুর অদৃষ্ট!

বেচারা দীনবন্ধু কাল সন্ধ্যায় হাসিমুখে আসিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিদায় লইয়াছে। কিন্তু অরুণার সংসারে এই যে মনান্তর ও অশান্তি সুরু হইল ইহা কি দীনবন্ধুর বিদায়ের সঙ্গেই বিদায় লইবে? নাঃ, সে আশা একেবারেই দুরাশা। দীনবন্ধুর পর নিত্যহরি। নিত্যহরিকে চিনিতে বাকী নাই। আজ সুবিমল যে কেন নিত্যহরিকে চিনিতে পারিতেছে না তাহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু চিনিতে তাহার দেরী হইবে না। তখন?

তখন এই নিত্যহরি আসিয়া অরুণার হাতে তাহার মামলা তুলিয়া

দিবে। যেমনই হোক, নিত্যহরিও দরিদ্র, সংসারী লোক। মামলায় হারিয়া সে যখন প্রস্থান করিবে তখন তাহারও চক্ষু একদফা বর্ষাইবে এবং অরুণার চক্ষুও শুষ্ক থাকিবে না। তারপর একজন আসিবে এবং অচিরে সহৃদয় বড়বাবুর ন্যায়নিষ্ঠার আক্রমণে প্রাণভয়ে অক্ষম তাহারই নিকটে আসিবে বরাভয় মাগিয়া এবং ফিরিয়া যাইবে সজলচোখে। এ কী অশান্তির শিকল তৈয়ারী হইতে চলিল, এ শিকলে অরুণার সংসার-তরণীর সচ্ছন্দ গতি যে রোধ হইয়া যায়। এ কী বিড়ম্বনা! নিত্য স্বামীর সঙ্গে কলহ, নিত্য গৃহের আকাশে মেঘের সঞ্চার। অথচ সবই পরের জন্য। কী দরকার তাহার তুচ্ছ বেয়ারার জন্য এত বিড়ম্বনা ভোগ করিবার?

আট

কিন্তু সুবিমলের ভাগ্য ভাল। কলহান্তরিতা পত্নীর একান্ত নিকটে থাকিয়া স্বেচ্ছাকৃত বিরহ ভোগ করার দুঃখ বড় দুঃখ। সেই দুঃখ হইতে তাহার ভাগ্য তাহাকে রক্ষা করিল।

যে দুঃসময়ে অভিমান-ভরে প্রিয়া শুধু গৃহিণীপণার গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সচিব ও সখির পদে ইস্তফা দেন, স্থূল শুষ্ক প্রয়োজনীয় কথা শেষ করিয়া অবান্তর প্রসঙ্গহীন গুঞ্জনের রস পরিবেশন করিবার জন্য আর অপেক্ষা করেন না, মুখর চোখ দুইটীকে মূক করিয়া এবং চপল ঠোঁটের প্রান্ত দৃঢ়সম্বদ্ধ রাখিয়া মিশরের মমির মতো মুখ করিতে চেষ্টা পান, সেই দুর্দ্দিনের দীর্ঘ অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা গৃহকোণে একাকী কাটাইবার যে ভয় সে করিতেছিল তাহা মিথ্যা হইল।

রিক্সা ভাড়া দিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার মুখেই তাহার সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা, যাঁহার মেয়ের বিবাহ আসন্ন। কাল রবিবার বিবাহ, আর আজ পাত্রের পিতা এক নূতন দাবী তুলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বন্ধু আর তাহাকে বিশ্রামের অবসর দিলেন না। বৈঠকখানায় বসিয়া নূতন সমস্যার কাহিনী শুনাইয়া তিনি সুবিমলকে টানিয়া লইয়া চলিলেন পাত্রপক্ষের সহিত রফা করিবার চেষ্টায়।

বাড়ীতে ফিরিতে যথেষ্ট রাত্রি হইল। কঠিন আরাধনায় পাত্রের পিতার দংশন হইতে বন্ধুকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া সুবিমলকে বন্ধুপত্নীর আতিথেয়তার অত্যাচার সহ্য করিতে হইল। অরুণা স্বামীর খাবার লইয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া নীচে অপেক্ষা করিতেছিল।

"কিছু খেতে পারব না, গোকুলকে বল একটা সোডা যদি পায় তো নিয়ে আসুক।" বলিয়া সুবিমল যখন উপরে চলিয়া গেল, তখন স্বামীর অসুস্থতার সম্বন্ধে অরুণার আর সন্দেহ রহিল না। সুবিমলের ইচ্ছা ছিল পাত্রের পিতার নির্লজ্জ লোভের কথা লইয়া কিছু আলাপ করে। কিন্তু উদ্বিগ্ন অরুণার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া সে ধারণা করিল অভিমানের মেঘ এখনও কাটে নাই। অতএব দাম্পত্য আলাপ করিবার তাহার ভরসা হইল না। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সোডা পান করিয়া সে শয্যা আশ্রয় করিল।

কিন্তু ঘুম আসিল না। মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী-জীবনের সমস্যা। অপরিমিত অর্থ লোভকে যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত দাবী বলিয়া চীৎকার করিল, ভিক্ষা ও দস্যুতা করিতে যাহার কুণ্ঠাও নাই, গ্লানিও নাই, সে ব্যক্তির লজ্জা হইল না, আর লজ্জা হইল তাহারই, যে সেই অন্যায় দাবী সর্ব্বস্ব দিয়াও মিটাইতে পারিতেছে না! কিন্তু

দুর্ভাগ্য এই যে, এই সব রক্তপায়ী জীবের সকাশেই কাতর মিনতি ও করজোড় প্রার্থনা করিতে হয় রক্তশোষণে সামান্যমাত্র অব্যাহতি পাইবার জন্য, এবং যদিই বা কোনও অবিবেকী তাহার দংশন সামান্য মাত্রও শিথিল করে, তবে ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহারই উদারতার জয়গান করিতে হয় তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া !

মনে পড়িল, ছেলের বাপের লিপ্সা মিটাইতে না পারায় বন্ধুর কী সকুণ্ঠ মিনতি। মেয়ের বাপ হইতে পারিয়াছে অথচ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে নাই, এই অপরাধের লজ্জায় বন্ধু মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারেন নাই ! কী আশ্চর্য্য !

মনে পড়িল ভাবী বৈবাহিকের গৃহ হইতে বাহির হইয়া বন্ধু একই নিঃশ্বাসে বৈবাহিককে গালি দিতে দিতে সুবিমলের কত প্রশংসাই করিলেন। "ভাই, তুমি না এলে কী হ'ত বল দিকি ! আজ রাত পোয়ালে কাল বিয়ে, আর এখন এই কাণ্ড। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ ও-শালা বুড়ো শকুনিকে টলাতে পারতো না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। তুমি যা উপকার করলে ভাই।"

মনে মনে সুবিমল জানিত বন্ধুর উপকার সে সত্যই করিয়াছে এবং যে টুকু কাজ তাহার দ্বারা হইয়াছে তাহা বন্ধুবরের দ্বারা হইত না। কিন্তু সে বিনয় ও ভদ্রতার খাতিরে বলিয়াছিল, "না না, আমি আর কী এমন করেছি। ও আমি না এলেও তুমি ঠিক manage করে নিতে পারতে।"

কৃতজ্ঞ বন্ধু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলেন, "আমি ? ওরে বাপ্ রে, আমার চোদ্দপুরুষের সাধ্যি ছিল ঐ বদ্‌মাস বুড়োকে কথার প্যাচে ঐ রকম কোণঠাসা করতে ? তোমার যুক্তিতর্ক, বাপ্ স্ ! কিন্তু দুঃখু

এই যে ওর আদ্দেকের ওপর মাঠে মারা গেছে, বুড়োর হেঁড়েমাথায় ও-সব ঢোকে নি, এ আমি বাজি রাখতে পারি। ওর মাথায় ঢুকেছে কোনগুলো জানো? সেই যখন তর্কের মাঝে মাঝে একটু ঢিলে দিচ্ছিলে, বলছিলে, দেখুন, আপনারা প্রাচীনলোক, সমাজের স্তম্ভ-স্বরূপ। আপনারা যদি পথ না দেখাবেন তো লোকে শিখবে কী করে? তখন বুড়োর মুখে এক ঝলক হাসি খেলে গেল, দেখেছিলে? তারপর তুমি যখন বল্লে, বড় গাছেইতো ঝড় লাগে, আপনি বিষয়ী লোক, এত পরিশ্রম ক'রে এই বিষয় সম্পদ করেছেন, টাকা রোজ-গারের কষ্ট আপনারই তো বোঝবার কথা, মিত্তিরমশাই। তখন তো বুড়ো বেশ নেবে এসেছে। দেখ ভাই, এইসব পাপিষ্ঠদের মনে ভগবান ঐটুকু দুর্ব্বলতা দিয়েছেন তাই রক্ষে। নিজের সুখ্যাতি নিজের কানে শুনলে যত বড় বুদ্ধিমানই হোক্ মন নরম হ'তেই হবে। আর, কার্য্যোদ্ধারের জন্যে একটু আধটু মিষ্টি কথার অবতারণা করতেই হয়, কী বল?"

বন্ধু মনের আনন্দে সারাটা পথ অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন এবং সুবিমল 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়া শুধু শুনিয়া গিয়াছিল। এখন নির্জ্জন রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই সকল কথার রোমন্থন করিতে করিতে তাহাদের মধ্যকার আসল অর্থটি হঠাৎ প্রকাশ পাইল। চড়াৎ করিয়া সুবিমলের মাথা গরম হইয়া গেল। যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ধারণা দৃঢ়-তর হইল যে, সে স্বার্থের জন্য,—বন্ধুর স্বার্থ এ-ক্ষেত্রে তাহার নিজেরই স্বার্থ,—এমন একজনের প্রশংসা করিয়াছে, যাহার সহিত কথা কহিতেও তাহার মন বিরূপ হইতেছিল। যাহার অসঙ্কোচ নীচতার পরিচয় পাইয়া নিরুপায় ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল,

তাহারই মন ভিজাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মহৎ বলিয়া বিশেষিত করিবার অপেক্ষা হীন তোষামোদ আর কী হইতে পারে? এই আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহার উদ্দেশ্য অত হীন ছিল না, সে শুধু চাহিয়াছিল লোক-টার হৃদয়ের কোমল ও উদার বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিতে। ইংরাজী করিয়া স্বগত তর্ক করিল—He was just appealing to the man's nobler instincts; কিন্তু কোন যুক্তিই নিজের বিচারে টিঁকিল না। তোষামোদ করিবার গ্লানি ও স্বার্থসিদ্ধি প্রয়াসের লজ্জা সুবিমলের মাথায় বিছার মত কামড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল এই রাত্রেই ছুটিয়া গিয়া বন্ধুকন্যার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া নীচাশয় বৃদ্ধকে শুনাইয়া আসে তাহার সম্বন্ধে সুবিমলের প্রকৃত মনোভাব কী। যতটুকু চাটুবাক্য সারা সন্ধ্যা ধরিয়া দুই বন্ধুতে শুনাইয়া আসিয়াছে, তাহার দশগুণ গালি দিয়া আসিতে পারিলে হৃদয়ের জ্বালায় বুঝি কিঞ্চিৎ শান্তি আসে। কিন্তু তাহা হইবার নয়, তাহা হইবার নয়! আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বন্ধুর গৃহে শানাই বাজিয়া উঠিবে। সর্ব্বস্ব-মূল্যে, তাহার উপর মানমর্য্যাদা ফাউ দিয়া, কন্যাপক্ষ যে আনন্দ কিনিয়াছেন, সেই মহার্ঘ্য আনন্দেই তাঁহারা এখন খুশী। তাহাদের জন্য তোষামোদ করিবার শাস্তি নিদ্রাহীন সুবিমলকেই একাকী ভোগ করিতে হইবে।

ঘণ্টা খানেক পরে গৃহস্থালীর পাট চুকাইয়া অরুণা যখন ঘরে আসিল, তখনও সুবিমল চক্ষু বুজিয়া গভীর অনুশোচনায় নিমজ্জিত। অরুণার পদশব্দ তাহার কাণে ঢুকিল না। অসুস্থ স্বামীকে নিদ্রিত মনে করিয়া অরুণা নিঃশব্দপদে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে

অতি স্তিমিত নীল আলো জ্বলিতেছিল। অরুণার একান্ত ও অভ্যস্ত দৃষ্টির পক্ষে সেই আলোই যথেষ্ট। সে দেখিল স্বামীর মুখে প্রচ্ছন্ন বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বুঝিল, রোগের যাতনা ঘুমের মাঝেও কাজ করিতেছে। জ্বর যে হইয়াছে তাহাতে তো সন্দেহ নাই, কিন্তু কতটা হইয়াছে তাহাই দেখিবার জন্য অরুণা অতি সন্তর্পণে সুবিমলের ললাটে হাত রাখিল। চমকিয়া উঠিয়া সুবিমল একবার চোখ খুলিয়াই চোখ বুজিল।

তারপর অরুণার হাতখানির উপর হাত রাখিয়া চাপিয়া ধরিল। সেই শীতল, কোমল স্পর্শে শুধু যে তাহার শ্রান্ত তাপিত মস্তিষ্কে আরাম বোধ হইল তাহাই নয়, তাহার মনের জ্বালাও যেন অর্দ্ধেক জুড়াইয়া গেল। পরম তৃপ্তিতে সে বলিল, “আ-াঃ”।

মনে শঙ্কা ছিল বলিয়া অরুণার হাতে সুবিমলের ললাট উত্তপ্তই ঠেকিল। সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, “বড্ড কষ্ট হচ্ছে? মাথাটা টিপে দেব?”

সুবিমল কহিল, “না, টিপে দিতে হবে না, তুমি শুয়ে পড় অরুণা, অনেক রাত হয়েছে।” বলিয়া সে পত্নীর হাতখানি আরও নিবিড় করিয়া নিজের ললাটে চাপিয়া ধরিল।

নয়

পরদিন রবিবারে অতি প্রত্যুষেই বিবাহবাটী হইতে গাড়ী আসিল অরুণাদের লইয়া যাইতে। সুবিধা থাকিলে পতির পদানুসরণ করিয়া পত্নীদিগের মধ্যেও বন্ধুত্ব অতি প্রগাঢ় হইয়া থাকে। সুতরাং অরুণার নিমন্ত্রণ মাত্র ভোজের নিমন্ত্রণই নহে, তাহা সারাদিনের আনন্দ কোলাহল ও কর্ম্মভোগেরও বটে। বিবাহ সম্বন্ধের সূচনা হইতেই সুবিমলের উপরই সকল ভার দিয়া বন্ধুবর নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছেন। বার বার বলিয়াছেন কন্যাকর্ত্তা তিনি নন, সুবিমল; এবং শুধু বিবাহ সমাধা নয় ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাইয়া দিয়া তবেই সুবিমলের নিষ্কৃতি। সুতরাং তাহারও ঐ গাড়ীতে সকালেই যাইবার কথা।

কিন্তু অরুণা সব ব্যবস্থা উল্‌টাইয়া দিল। অত সকালে সুবিমলকে বিবাহবাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা, বিছানা হইতে নামিতেই দিল না। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই, সারা রাত্রি জ্বর ভোগ হইয়াছে, অথচ সেখানে পৌঁছিবামাত্র সকল কাজের ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া সুবিমল যে একটী মুহূর্ত্ত বিশ্রাম লইবে না এবং অসুস্থ শরীরে যে একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে, তাহাতে অরুণার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রোগের অস্তিত্ব সুবিমল পুনঃপুনঃ অস্বীকার করিল। কিন্তু অরুণার ধারণাও যেমন অচল, নির্দ্দেশও তেমনি অটল রহিল। অবশেষে সুবিমল থার্ম্মোমিটার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাইল তাহার দেহের তাপ সম্পূর্ণরূপে জ্বরের সীমানার বাহিরে। অরুণা বলিল, "তাই হোক

বাপু, জ্বরটা না হয় ছেড়েইছে তা' বলে এত ভোরে তোমাকে আমি উঠতেই দোব না, তা' বিয়ে বাড়ী যাওয়া।"

সুবিমল হাসিয়া বলিল, "জ্বরটা ছেড়েছে কি গো? জ্বর এলো কখন যে ছাড়বে?"

"এসেছিল কি না এসেছিল, সে কি তুমি বলে দেবে তবে আমি জানব? নিজের গা গরম কি নিজে টের পাওয়া যায়? আমি দেখেছি তাই বলছি। মিছে তর্ক করে আর জ্বর টেনে এনো না তুমি, দোহাই তোমার।"

"কী আশ্চর্য্য! রাত্তিরে আমার জ্বর এসেছিল, তুমি নিজে দেখেছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন?" সুবিমল হাসিতে লাগিল।

অরুণা রাগ করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি না আমি। হ্যাঁ, আমার মাথা খারাপই হয়েছিল। বেশ, তুমি যেতে চাও তো যাও। কিন্তু তা' হলে আমি আর যাব না, এই বলে রাখলুম। আর আমাকে যদি যেতে হয় তবে তোমার এখন থেকে গিয়ে ওদের ঐ ঝঞ্কাটে মাতা চলবে না। এই আমার শেষ কথা।"

নিরুপায় সুবিমল বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অরুণা তাহার বুক অবধি চাদর ঢাকা দিয়া পাখাটা মৃদুগতিতে ঘুরাইয়া দিয়া গেল।

যাত্রা করিবার আগে আর একবার অরুণা স্মরণ করাইয়া দিল, আরও অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে গোকুল আদা সহযোগে চা ও টোষ্ট করিয়া আনিলে সুবিমল প্রাতরাশ করিবে। তারপর যথেষ্ট রৌদ্র উঠিলে গোকুল প্রদত্ত গরম জলে উপরের বাথরুমে গা মুছিবে,—নীচে কলতলায়

নামা ও স্নান, দুই-ই নিষিদ্ধ, এবং বেলা দশটার পর গোকুল আনীত গাড়ী করিয়া সুবিমল বিবাহ-বাটীতে যাইবে ও সেখানে পৌছিয়াই অরুণার সঙ্গে দেখা করিয়া তবে তাহার অন্য কাজ। এই কার্য্যক্রমের একচুল এদিক ওদিক হইলে তখনই অরুণা ছেলেদের লইয়া চলিয়া আসিবে তাহাও পরিশেষে জানাইয়া দিল। প্রতিবাদ করা বৃথা এবং প্রতিরোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া সুবিমল স্বীকার করিল আজকের মত সে গোকুলকেই তাহার অভিভাবক বলিয়া মানিয়া লইবে ও স্ত্রীর নির্দ্দেশও পালন করিবে। মিথ্যাবাদিতার অপরাধ এড়াইতে মনে মনে বলিল, 'অবশ্য অবস্থা হিসাবে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন সহ।'

দশ.

সোমবার সুবিমল অফিস হইতে সকাল সকাল ছুটি লইয়া আসিল। আগের দিন বিবাহ বাটীতে পরিশ্রম যথেষ্টই হইয়াছিল তবে সুখের কথা এই যে বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরের বাপের সম্বন্ধেই কিছু ভয় ছিল, তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে আবার শেষ মুহূর্ত্তে লভ্যাংশ বাড়াইবার নূতন কোনও ব্যবসায়বুদ্ধি না গজাইয়া উঠে। কিন্তু আশাতীত সৌভাগ্যের বিষয় যে তিনি ভদ্রলোকের মতোই ব্যবহার করিয়াছেন। এই অনুগ্রহে কন্যাপক্ষ নিরতিশয় বাধিত হইয়া গেছেন। উভয়পক্ষে যথারীতি আপ্যায়নের আদান প্রদান হইয়াছে। কন্যাকর্ত্তার বিকল্প হিসাবে ও কয়দিনের পরিচয়ের দরুণ সুবিমলেরই সঙ্গে নূতন বৈবাহিকের বেশী আলাপ চলিয়াছিল। কুটুম্ব নূতন, অর্থ ও মর্য্যাদা দুয়েরই অভাব নাই, তাহার উপর বৈবাহিকমহাশয় বয়সেও প্রায়

প্রাচীন। অতএব গালি দেওয়া দূরের কথা, অবস্থা ও কাল উপযোগী আলাপ করিতে সুবিমলকে অনেক মিষ্ট কথাই ব্যবহার করিতে হইয়াছে এবং সে সকল কথার অধিকাংশই তাহার হৃদয় হইতে আসে নাই। কিন্তু কী করা যায়। আপ্যায়ণ ও আন্তরিকতা এক পথে কদাচিৎ চলে এবং সৌজন্য প্রকাশে সত্য কথার স্থান খুব বেশী নাই।

আজ অফিসে বসিয়া সুবিমল প্রচলিত সভ্যতার কুরীতি চিন্তা করিয়া ও নিজের মিথ্যাচরণ স্মরণ করিয়া অস্বস্তি বোধ করিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে অরুণা ও তাহার মধ্যের গুমোট ভাবটা যে অনেকখানি হালকা হইয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া তাহার অস্বস্তি তাহাকে বিশেষ পীড়া দিতে পারে নাই।

অফিসে আসিয়া অফিসের কাজ আজ বেশী করা হয় নাই বটে কিন্তু একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্য সে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা দীনবন্ধু বিদায় সমস্যার সমাধান।

অতি সকালেই পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া নিত্যহরি আসিয়া অফিসের বারান্দায় বসিয়া ছিল। এবং মলিন মুখে দীনবন্ধু তাহার অভ্যস্ত টুলটি অধিকার করিয়া বিদায় অপেক্ষা করিতে ছিল। দীনবন্ধুর মুখের হতাশার ম্লানিমা ও নিত্যহরির মুখভরা আশার ঔজ্জ্বল্য দুই-ই বড়বাবুর চোখে পড়িয়াছে। নিত্যহরির কেশের তৈল-চিক্কণ পারিপাট্য ও দীনবন্ধুর রুক্ষ কেশ, ইহাও তাহার চোখ এড়ায় নাই। কিন্তু সঙ্কল্প স্থির করিতে তাহার দেরী হয় নাই। কর্ত্তব্য অপ্রিয়, দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস পড়িবেই। তবু আজই ইহার নিষ্পত্তি না করিলে তাহার মনের অস্বস্তিরও নিবৃত্তি নাই। তুচ্ছ দীনবন্ধুর জন্য স্বামী-স্ত্রীতে কলহ চলিবে, ইহার চেয়ে হাস্যকর নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছু হইতে পারে না। কাল অরুণার ব্যবহারে মনে হয় সেও ইহা

বুঝিয়াছে। দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লইয়া সে আর বাক্যব্যয় করিবে না বোধ হয়।

অফিসে এই সকল চিন্তাই সুবিমল করিয়াছে। আর বার বার তাহার মানস-চোখে ভাসিয়াছে সুসজ্জিতা অরুণার সুমোহন মুখখানি। বিবাহবাড়ীতে সুন্দরী-সমাবেশ কম হয় নাই। অলঙ্কার, বস্ত্র, আভরণে চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য্যের হাট বসিয়াছিল। কন্যার মাতৃস্থানীয়া হইয়া অরুণা রঙ্গীন কাপড় ও বিবিধ গহনা পরিয়া নিজের গৃহিণীপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নাই। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের হাটে স্বল্প-ভূষিতা অরুণার মতো এমন নয়নানন্দ রূপ তো তাহার চোখে পড়িল না, এমন মধুর সুষমা তো আর কোনও মুখশ্রীতে লক্ষ্য হয় নাই। আরও মনে পড়িল, শত কাজের ব্যস্ততার মাঝেও বার বার অরুণার স্বামীর তত্ত্ব লওয়া ঠিক আছে। রাত বেশী হইয়াছে বলিয়া সুবিমলকে অসুস্থ জ্ঞানে পেট ভরিয়া খাইতে পর্য্যন্ত দিল না এবং ঐ কল্পিত অসুখের জন্যই শত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া অরুণা রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তোষামোদ-রূপ পাপের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে মনে উদয় হইতেছিল কিন্তু তাহাকে সুবিমল আমল দেয় নাই। সে অরুণার অনবদ্য মুখখানি ও তাহার অপরিমেয় ভালবাসার চিন্তা করিয়াই সময় কাটাইয়াছে। দেহের ক্লান্তি সত্ত্বেও মনের শান্তি বারো আনা রকম ফিরিয়া আসিয়াছে। বেয়ারা সমস্যার মীমাংসা করিয়া বাকি চার আনাও উদ্ধার করিবে, ইহা সুবিমল স্থির করিয়াছিল। এবং তাহাই করিয়া সে সকাল সকাল অফিস হইতে চলিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল অরুণা তখনও ফিরে নাই। সকালে সুবিমল বাহির হইবার পরই সে ছেলেদের লইয়া ও-বাড়ীতে গিয়াছে বরকন্যাকে

বিদায় দিতে। এই ব্যবস্থাই ছিল। এত শীঘ্র সে ফিরিবে এ আশা সুবিমল করে নাই।

অল্প-বিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর উৎসব। অত্যন্ত চড়া দরে ইহা কিনিতে হইয়াছে, অদূরভবিষ্যতে ইহার পুনরাবৃত্তি হইবে এ আশাও নাই। তাই গরীব পেটুক বালকের সন্দেশ খাওয়ার মতো ইহা শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। সন্দেশ ফুরাইয়া গেলেও হাত চাটা ফুরায় না। বরকন্যাকে বিদায় দিতেই হইবে নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণের মধ্যে; কিন্তু আনন্দের অবসর যাহাদের অপর্য্যাপ্ত নহে, সুযোগ যাহাদের ঘন ঘন আসে না, তাহাদের মেলা ভাঙ্গিবার সময় পাঁজিতে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় নাই। অতএব সন্ধ্যার এ দিকে অরুণার ফিরিবার আশা করা দুরাশা। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সিগারেটের কৌটাটি লইয়া সুবিমল জানালার ধারে ইজি-চেয়ার টানিয়া তাহার কোলে রাত্রি-জাগরণক্লান্ত শরীর সমর্পণ করিল।

কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়া সুবিমল দেখিল বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শব্দ আসিতেছিল তাহার পিছনে বারান্দা হইতে। শুনিল চাপা গলায় অরুণা বলিতেছে, "আচ্ছা, তুমি এখন এসো। হ্যাঁ, বাড়ীতে কালই চিঠি লিখে দিও। কদিন চিঠি দাওনি বলছ।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "হ্যাঁ মা, কালই দোব। ক'দিন যে কী ভয়ে কাটছে মা তা আর বলতে পারি না।"

অরুণা বলিল, "যাক্, এখন তো ভয় গেছে, কিন্তু তুমি তো শুনেছি কাজকর্ম্ম সব জানো, ইংরেজি হরফ পড়তে পার। তোমার চাকরীর জন্যে এত ভাবনা হয়েছিল কেন? এত আপিস রয়েছে কলকাতায়।"

"আর মা, আজকাল আর সেদিন নেই। আমার মতন কত

লোক বসে রয়েছে। আমার আর একটা মুস্কিল হয়েছে মা জ্বরে ভুগে ভুগে শরীরটা বড়ই কাহিল হয়ে গেছে, সিঁড়ি ভাঙতে আর পারি না। বড় আপিসের কাজে ওপোর নীচ করতে হয় অনেক। সে আমি পেরে উঠব না মা, চাকরী পেলেও চাকরী রাখতে পারব না। আমার এই ছোট আপিসই ভালো। আচ্ছা, আসি মা।"

"এসো। আহা, থাক থাক, ঐ হয়েছে।"

প্রসন্ন-স্মিত মুখে সুবিমল ইহাদের কথোপকথন শুনিল। বুঝিল এইবার অরুণা একটি সাষ্টাঙ্গ না হইলেও ভূমিষ্ঠ প্রণাম লাভ করিল।

"বাবুর বড় দয়ার শরীর মা, দেবতার মতন বাবু।"

"এই রে! ও কথা বলো না, ও কথা বলো না, দেবতা টেবতা বলো না দীনবন্ধু। তোমার বাবু শুনতে পেলে আবার ক্ষেপে যাবেন। এবার থেকে খুব সাবধান হয়ে থেকো বাপু, ভক্তি টক্তি যা করতে হয় মনে মনেই কোরো। তোমাকে তো বলেছি উনি ঐসব মনরাখা মিষ্টি কথা ভয়ানক অপছন্দ করেন।"

যদিচ অরুণার কণ্ঠে ও কথায় পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না তথাপি বৈবাহিক-আপ্যায়নকারী সুবিমল যেন দেখিল অরুণার চোখে মুখে চাপা হাসি খেলিয়া যাইতেছে।

পদশব্দে বোঝা গেল দীনবন্ধু প্রস্থান করিল। আর একজোড়া কোমল পদশব্দে ইহাও বোঝা গেল যে অরুণা আসিতেছে। ক্ষণ পরেই চুলের ভিতর লীলায়িত কোমল স্পর্শ পাইয়া সুবিমল কহিল, "এরই মধ্যে ভক্ত চলে গেল যে? দেবী-বন্দনা এত শীগ্‌গীর শেষ হল?"

"ও মা! তুমি জেগে আছ? এই যে দেখে গেলুম ঘুমোচ্ছ।"

সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে সুবিমল বলিল, "ঠিকই দেখেছিলে।

কিন্তু দীনে বেটা আবার কী করতে এসেছিল? দেবীর বর প্রার্থনা করতে?"

অরুণা জবাব দিল, "না বরলাভ তো ওর হয়ে গেছে দেবতার কাছে। তাই দেবতাকে পেন্নাম করতে এসেছিল বোধ হয়!"

"নাঃ, বেটাকে তাড়ালেই দেখছি হতো।"

পরমাদরে মাথার উপরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অরুণা বলিল, "ঈস।" তারপর হাসিমুখে বলিল, "কী গো মশাই, তবে যে বড় বলেছিলে আমার কথা রাখতে পারবে না? ওকে চাকরীতে রাখা কিছুতেই চলবে না?"

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া সুবিমল বলিল, "বলেছিলুম ঠিকই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেঁকাতে পারলুম না। কিন্তু তুমি যে এর মধ্যে চলে এলে? আমি তো জানতুম অন্ততঃ রাত্তির দশটার আগে আর তোমার ছাড়ান নেই।"

"ছাড়তে কি চায়? কত ঠাট্টা করতে লাগল, শেষে রাগ-দুঃখুও করলে।"

"তবে এত তাড়া করে আসার কারণ?"

"এলুম আমার খুশী। আমার মন কেমন করছিল তাই এলুম বড়বাবু, আপনার ভালো না লাগে তো বলুন চলে যাচ্ছি।" বলিয়া অরুণা তাহার মাথা হইতে হাত তুলিতেই সুবিমল হাত বাড়াইয়া তাহার হাতখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "তা যেতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

(বঙ্গশ্রী—মাঘ-ফাল্গুন ১৩৪৯)

সস্ত্রীক

বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিবার একটু পরে শিবেন্দু আবার আসিয়া হাজির হইল। হাওড়া ছাড়িবার পর ইহারই মধ্যে বার দুই আসিয়া মাধুরীর খবর লইয়া গিয়াছে। আবার সে আসিল, এবং এবারে শুধু হাতে নয়, একটা খাবারের চ্যাঙারি সমেত। দেখিয়া মাধুরীর সামনের বেঞ্চের চশমা-পরা মেয়েটীর ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শিবেন্দু বলিল, "এই নাও ধরো। কিন্তু তোমার সীতাভোগটা বাপু তেমন ভালো মনে হল না। তাই খালি মিহিদানাই নিলুম। কী বল?"

শুনিলে মনে হইতে পারে মাধুরী বুঝি গাড়ীতে উঠিবার আগে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিল বর্দ্ধমানে আসিয়া তাহাকে সীতা-ভোগ মিহিদানা কিনিয়া দিতেই হইবে। কিন্তু তাহা নয়। শিবেন্দুর কথাই ঐ রকম।

মাধুরীকে খাবারের চ্যাঙারি হাতে লইতে হইল। লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কী হবে তোমার মিহিদানা?"

এ প্রশ্ন অবশ্য নিষ্প্রয়োজন। মিহিদানার ব্যবহার মাধুরীর অজানা নাই। কিন্তু প্রশ্ন তো তাহার কথায় নয়, প্রশ্ন তাহার কথার সুরে। কিন্তু মিষ্টান্ন-বিলাসী শিবেন্দু তাহার সুর লক্ষ্য করিল না, সে কথারই জবাব দিল।

—"খাবে, আবার কী হবে। একেবারে গরম, মানে বেশী গরম

নয়, বেশ খাবার মতন আছে। খেয়ে দেখ না, ভারি মোলায়েম লাগবে।”

শিবেন্দুর মুখের উপর মিহিদানার মোলায়েমত্ব ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টান্ন সম্বন্ধে তাহার দুর্ব্বলতাও যত, সবলতাও তেমনই। খাবার, ভালো ও হাতের কাছে পাইলে, শিবেন্দু রসনা সংযত করিতে পারে না। কিন্তু ইহার জন্য তাহার কুণ্ঠা বা লজ্জার বালাইও নাই।

মাধুরীর হাসি পাইল। তবু সে গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “গরম থাকে ভালোই, তুমি খাও না।”

শিবেন্দু কহিল, “সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আধ সেরটাক্ আগে চেখে দেখেছি, তবে এই এনেছি। চমৎকার জিনিষ, খেলেই বুঝতে পারবে।”

শুনিয়া সামনের বেঞ্চের চশমা-পরা মেয়েটির ঠোঁটের হাসি কিঞ্চিৎ প্রসারিত হইল। মাধুরীরও গাম্ভীর্য্য টিকিল না। হাসিয়া বলিল, “তা বুঝেছি, মিষ্টি মাত্রেই তোমার কাছে চমৎকার।” বলিয়া মাধুরী চ্যাঙারি তাহার পাশে বেঞ্চের উপর রাখিল।

দেখিয়া শিবেন্দু বলিল, “বাঃ, রেখে দেবার জন্যে আনলুম বুঝি? সকালে যা তাড়াহুড়ো করে খাওয়া, তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। খানিকটা মেরে দাও না। দাঁড়াও, জল এনে দিচ্ছি।”

শিবেন্দুর ব্যস্ততায় মাধুরী বিব্রত হইল। কিন্তু বারন করিবার অবসর পাইল না। ততক্ষণে শিবেন্দু জলের যোগাড়ে ছুটিয়াছে। চশমা-পরা মেয়েটীর হাসি এবার তাহার ঠোঁটের আবরণ ভেদ করিয়া দন্ত-পংক্তি পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। মেয়েটির পাশে তাহার মা বসিয়া আছেন। তাঁহারও চোখে চশমা। মাধুরী মুখ ফিরাইতে তাঁহার সহিত

চোখাচোখি হইল। বর্ষীয়সী মহিলা বলিলেন, "ক্ষিদে পেয়েছে, খাওনা মা, লজ্জা কী? গাড়ীতে অত লজ্জা করতে গেলে চলে না।"

মাধুরীর লজ্জা আরও বাড়িয়া গেল। আরক্ত মুখে বলিল, "না না, ক্ষিদে পাবে কেন? এই তো বেলা দশটায় খেয়ে দেয়ে গাড়ীতে উঠেছি, এখনও দু'ঘণ্টা হয় নি। ওর ঐ রকম কথা।"

শিবেন্দুর ফিরিবার পূর্ব্বে এক টিকেট-চেকার আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েদের কামরার যাত্রী বেশী নাই। আজকাল অধিকাংশ স্ত্রীলোকই পুরুষ সহযাত্রীর সঙ্গে সাধারণ গাড়ীই ব্যবহার করেন। মাধুরী দেখিল চশমা-পরা মেয়েটি তাহার ভ্যানিটী ব্যাগ খুলিয়া দুইখানি টিকেট বাহির করিয়া দিল, তাহার নিজের ও তাহার জননীর! ও-দিকের জানালার ধারে যে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে গাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে যাবতীয় সামগ্রী দেখিতেছিল এবং অনর্গল বাক্যস্রোতে সকলের সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, চেকারকে গাড়ীর দিকে আসিতে দেখিয়াই সে হঠাৎ নিদারুণ ব্রীড়াময়ী হইয়া উঠিল। চট্ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া, মাথার উপর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সে জানালার বাহিরে বিপরীত দিকের শূন্য প্লাটফর্মে কী যে পরম পদার্থ দেখিতে মনঃসংযোগ করিল, তাহা সেই জানে। কিন্তু মনঃসংযোগের একাগ্রতা তাহার অপূর্ব্ব। চেকার তাহার কাছে গিয়া বলিল, "টিকেট?" জবাব না পাইয়া আবার বলিল, "আপকো টিকেট জেরা দেখলাইয়ে।"

স্ত্রীলোকটি শুনিতে পাইল না। চেকার একটু উচ্চৈস্বরে বলিল, "টিকেট দেখলানা।"

বাহিরের জগতে তখন কী অদ্ভুত বিস্ময়জনক ব্যাপারই না ঘটিতেছে!

একান্ত নিবিষ্টচিত্তা রমণীর কানে এবারও চেকারের কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। চেকার ঈষৎ কাশিল,—গলা পরিষ্কার করিবার জন্তই হউক বা বহির্মনা ললনার মনকে অন্তর্মুখী করিবার উদ্দেশ্যেই হউক। কাশিয়া বলিল, "দেখিয়ে—ইয়ে শুনিয়ে, কী মুস্কিল, ইয়ে আপকো টিকিট হায়, আঃ—"

ব্যর্থ হইয়া চেকার মেঝেতে পা ঠুকিল। কিন্তু মেঝেয় কিম্বা কোথাও পা ঠুকিয়া রমণীর মন আকর্ষণ করা যায় না, ইহা চেকার বাবুর তখনো শিখিতে বাকী ছিল।

তখন বিপন্ন ও বিরক্ত চেকার টিকেট ফুটা করিবার যন্ত্রটি দৃঢ় মুষ্টিতে বাগাইয়া ধরিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্রাবৃত মাথাটীর উপর,—মারিল না,—মাথাটীর উপরে গাড়ীর কাঠের দেয়ালে ঠুকিয়া শব্দ করিল ও সেই সঙ্গে মেঝেতে পুনরায় পাও ঠুকিল।

এত সাধনা বিফল হইল না। রমণীর মন টলিল, ধ্যান ভাঙ্গিল। মাথা ফিরাইয়া লজ্জাশীলা দুইটী, আয়ত না হইলেও, আঁখি তুলিয়া বারেক চেকার বাবুর পানে চাহিয়াই মাথা নীচু করিল!

চেকার কহিল, "টিকেট হ্যায় ?"

স্ত্রীজনোচিত ও স্বাভাবিক লজ্জায় রমণীর মুখ খুলিল না। অবগুণ্ঠিত মাথা হেলাইয়া জানাইল, "হ্যায়।" চেকার হাত পাতিল। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া রমণী তখন আবার বাহিরের পানে তাকাইয়াছে।

এবারে পুরুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল। আবার গাড়ীতে জোরে জুতা ঠুকিয়া অতি উগ্রকণ্ঠে চেকার আদেশ করিল "টিকেট দেখলাও।"

অতঃপর সেই চেকার ও হিন্দুস্থানী রমণীর মধ্যে আলাপ শুরু হইল।

রমণী অবগুণ্ঠন ও লজ্জাভার বিসর্জ্জন দিয়া টিকেট সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিল। শুধু বলিল না, শপথ করিয়া বলিল, টিকেট তাহার আছে পাশের গাড়ীতে তাহার সঙ্গী মরদের কাছে। চেকার চাহিল রমণী পাশের গাড়ীতে কোন মরদ তাহার সঙ্গী তাহা দেখাইয়া দিক। অগত্যা অবলা রমণী আবার শপথ করিল, বলিল, তাহার সঙ্গী গাড়ী ধরিতে পারে নাই, হাওড়ায় পড়িয়া আছে। পরের গাড়ীতে আসিতেছে। বিশ্বাস না হয় চেকার হাবড়ার টিসনে 'তার' ভেজিয়া সন্ধান লইতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ সে তাহার সঙ্গ ছাড়া সঙ্গীর নামও বলিয়া দিল। ইহার পর আর অবিশ্বাস করা চলে না। তাই চেকার প্রস্তাব করিল রমণী যেন এই ষ্টেশনে নামিয়া পরের গাড়ীতে আগন্তুক সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করে। এবং নিজের প্রস্তাবের সমীচীনতা সম্বন্ধে চেকার এতই নিঃসন্দেহ যে স্ত্রীলোকটীর মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটী পুঁটুলি তুলিয়া লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। অগত্যা অপর গাঁঠরটী লইয়া সেই লজ্জাশীলা নারী প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতে করিতে চেকারের পিছনে চলিল।

চশমা-পরা মেয়েটী বোধকরি কলেজে পড়া। পথে ঘাটে অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে তাহার বাধে না। চেকার ফিরিয়া আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওর কি টিকিট নেই? তাই বুঝি ওকে নামিয়ে দিলেন?"

চেকার একটি "হ্যাঁ" বলিয়া দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিল। মেয়েটী বলিল, "ওকে কি পুলিশে দিলেন?"

চেকার মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাঃ, পুলিশে আর দিলুম না। হাজার হোক মেয়েছেলে। ঐ নামিয়ে দিলুম। কিন্তু নামিয়ে দেওয়াও যা আর

না দেওয়াও তা। এতক্ষণে হয় তো আর একটা কামরায় উঠে পড়েছে। আর নয় তো পরের গাড়ীতে উঠবে। আবার যতক্ষণ না কোথাও নামিয়ে দেয় ততক্ষণ চড়ে নেবে। এই করতে করতে দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

চেকার আসিয়া মাধুরীর সামনে হাত পাতিল। কিন্তু নিজের কথার সূত্র ধরিয়া মেয়েটীর দিকেই চাহিয়া বলিল, "ওরা ঐ করেই চালায়। শুধু মেয়েছেলে কেন, ওদের পুরুষগুলো পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ বিনা টিকিটেই চালিয়ে দেয়।" চেকার হাসিয়া মাধুরীর দিকে ফিরিল।

মেয়েটী হাসিল। মেয়েটীর জননীর মুখেও যেন হাসির আভাস ফুটিল। কিন্তু মাধুরীর মুখ শুকাইয়া গেল। তখনও শিবেন্দুর দেখা নাই। মাধুরীর দুশ্চিন্তা হইল কী বলিবে সে। ঐ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের সহিত তাহার তো কোনও প্রভেদ নাই। তাহাকেও তো বলিতে হইবে টিকেট তাহার কী একটা আছে, কিন্তু তাহার কাছে নয়, আছে তাহার সঙ্গী পুরুষের কাছে। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। এখনই হয় তো চেকার মেঝেতে জুতা ঠুকিবে। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "টিকিটটা, দেখুন, আমার কাছে নেই, যাঁর কাছে আছে তিনি জল আনতে গেছেন, একটু দাঁড়ান, এক্ষুনি আসছেন।"

তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া চেকার বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ঘুরে আসছি।" তারপর বলিল, "বিনা টিকেটের প্যাসেঞ্জার আমরা দেখলেই চিনতে পারি। আজ তের বচ্ছর এই কাজ করছি।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া চেকার চলিয়া যাইতেছিল। সেই সময়

এক ভাঁড় জল লইয়া শিবেন্দু আসিয়া পড়িল। মাধুরী নিশ্চিন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "এই যে উনি এসেছেন।"

চেকার ফিরিয়া দাঁড়াইল। শিবেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কী? কি হয়েছে?"

চেকার বলিল, "না, কিছু হয় নি। এঁর টিকেটটার কথা হচ্ছিল, আপনার কাছে—"

শিবেন্দু কহিল, "হ্যাঁ, আমারই কাছে আছে, এই যে।" বলিয়া কোটের ভিতরের পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া দিল।

পড়িয়া চেকার বলিল, "সেল্ফ্ এণ্ড্ ওয়াইফ্, বেনারস। তাই বলুন। আপনি আমাদেরই দলের। কোন্ ডিপার্টমেণ্টে আছেন? হেড অফিসে নিশ্চয়?"

শিবেন্দু বলিল, "হ্যাঁ, অডিট্-এ।"

চেকার বলিল, "সুখে আছেন দাদা, দিব্যি আছেন। এই দেখুন দিকি কদিন ছুটী আছে, চল্লেন কাশী। স্রেফ্ দুজনকার মতন একটা পাশ কেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আনন্দকে আনন্দও হল, আবার সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎকে ধর্ম্মমাচরেৎও হল। দিব্যি আছেন।"

কথা শেষ করিয়া চেকার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। লোকটী কিছু বেশী কথা কহিতে ভালবাসে। কথা কহিয়াই তাহার আনন্দ, শ্রোতার ভাল লাগিল কি না লাগিল তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

মাধুরী মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিন্তু মুখ ফিরাইয়াও স্বস্তি নাই। চশমা-পরা মেয়েটী কান দিয়া চেকারের কথাগুলি গিলিতেছে। এবং চোখ না তুলিয়াও মাধুরী যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই কলেজে পড়া, আইবুড়ো মেয়েটা চোখ দিয়া তাহাকে ও শিবেন্দুকে গিলিতেছে।

তখন চেকার বলিতেছে, "আর আমাদের চাকরী? আর বলবেন না দাদা। একটা দিন ছুটী নেই! দিন নেই, রাত নেই, খালি ডিউটি। আর ডিউটি বলে ডিউটি? আপনাদের মতন ভদ্দর লোকের ডিউটি, যে, পাখার তলায় বসে দশটা পাঁচটা? রাম বল! গাড়ীতে গাড়ীতে প্রাণ হাতে করে ছোটাছুটি।" হঠাৎ গলা নামাইয়া চেকার বলিয়া চলিল, "মাসের মধ্যে আদ্দেকটা মাস রাত্তিরে বাড়ীতে শুতে পাই না মশাই। বাড়ীতে রাগ করে, বলে, হয় চুলোর চাকরী ছেড়ে দাও, নয় তো ঘর সংসার ছেড়ে দাও। বলবে না মশাই, বলুন তো?"

শিবেন্দু জলের ভাঁড় হাতে করিয়া শুনিতেছিল, না শুনিয়া উপায় নাই বলিয়াই। এতক্ষণে একটু ফাঁক পাইয়া বলিল, "তা তো বটেই।" বলিয়া জলের ভাঁড়টি আগাইয়া দিয়া মাধুরীকে বলিল, "এই নাও মাধুরী, জলটা ধরো।"

বলিয়াই পাছে চেকার আবার শিবেন্দুর গার্হস্থ্য-জীবনের সুখের সহিত নিজের জীবনের দুঃখের তুলনা শুরু করিয়া দেয় এই ভয়ে মাধুরীর ধরিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া ভাঁড়টী বেঞ্চের উপর রাখিয়া নিজের কামরার দিকে অগ্রসর হইল।

চেকার ডাকিয়া বলিল—"এই যে দাদা, আপনার পাশটা।" শিবেন্দুকে ফিরিতে হইল।

"শেষকালে ওঁকে আবার ঐ খোট্টা মেয়েছেলেটার মতন,—হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

বোধকরি টিকেটহীনা মাধুরীর কিছু আগের শুষ্ক মুখ মনে করিয়াই চেকার হাসিতে হাসিতে মাধুরীর মুখখানি একবার দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু একখানি রক্তবর্ণ কান ব্যতীত মুখের আর কোনও অংশ

তাহার চোখে পড়িল না। "পাশে"র কাগজটীর উপর কী একটু লিখিয়া সেটী ফিরাইয়া দিয়া চেকার প্রস্থান করিল।

শিবেন্দু বলিল, "যত সব রাবিশ! মাধুরী তুমি খেয়ে নাও, বুঝলে, আমি চল্লুম, গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে।" শিবেন্দু পিছন ফিরিল।

মাধুরীর ক্ষুধা পায় নাই। তবু যদিবা শিবেন্দুর নির্ব্বন্ধে কিছু মুখে দিত, এখন সেদিকে তাহার মন একেবারেই গেল না। মন তাহার আটকাইয়া রহিল চেকারের শেষের কথা কয়টীতে। সত্যই তো, ঐ যে কাগজের টুকরাটী, যাহার দ্বারা রেল কোম্পানী তাহাদের বিনামূল্যে কাশী যাতায়াতের অনুমতি দিয়াছে, সেই কাগজটী যদি শিবেন্দুর কাছে থাকে, তবে পথে আবার কোনও চেকার উঠিয়া টিকেট চাহিয়া তাহাকেও যে বিপদে ফেলিবে না তাহার নিশ্চয়তা কী।

মাধুরী কহিল, "আচ্ছা খাব'খন। কিন্তু তুমি দাঁড়াও, আমি মনে করছি তোমার গাড়ীতে যাব।"

বলিতে বলিতে একহাতে খাবারের চ্যাঙারি ও অন্যহাতে জলের ভাঁড় লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শিবেন্দু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, এ গাড়ীতে কী হল? এই তখন বল্লে অত পুরুষের ভিড়ে যেতে ভাল লাগে না। এখানে বেশ গল্প করতে করতে যাবে। আবার কী হল?"

মাধুরী বলিল, "হোকগে ভিড়। তুমিও নিশ্চিন্দি থাকিতে পারছ না, পঞ্চাশবার এসে এসে খবর নিতে হচ্ছে। আর আমারও কেমন যেন ভয় ভয় করছে বাপু আলাদা যেতে।"

শিবেন্দু হাসিয়া কহিল, "দূর, দিনের বেলায় আবার ভয়ের কী আছে! তা যেতে চাও চল, চট্ করে এসো, এক্ষুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।"

শিবেন্দু কামরার ভিতর এক পা উঠিয়া বাঙ্কের উপর হইতে মাধুরীর স্থটকেসটী তুলিয়া লইল। মাধুরী গাড়ী হইতে নামিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আসি, আবার দেখা হবে। আমরা তো আপনাদের ষ্টেশনেই নামচি, ওখানে দু'এক দিন থেকে কাশী যাব।"

চশমা-পরা মেয়েটী দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "আচ্ছা, নমস্কার।" মেয়েটীর মা কেবল ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় কাত করিলেন। মাধুরীর দুইটী হাত জোড়া থাকায় প্রতিনমস্কার করিতে পারিল না। চলিতে চলিতে মনস্থ করিল, আর কিছু পারুক না পারুক বিদেশে থাকিয়া স্বামীর সহিত অকুণ্ঠ ভ্রমণে পুরুষের মত হাত তুলিয়া নমস্কার করাটা অন্ততঃ অভ্যাস করিবেই।

পাশাপাশি গমনশীল শিবেন্দু ও মাধুরীকে দেখিতে দেখিতে চশমা-পরা মেয়েটী বলিল, "দুটীতে বেশ মানিয়েছে, নয় মা ?"

মা কহিলেন, "হুঁ।"

মেয়েটি আবার বলিল, "আচ্ছা মা, কার রঙ বেশী ফরসা বল তো ? বউটির, নয় ?"

মা বলিলেন, "কে জানে বাবু, অতশত আমি দেখিনি।"

মেয়েটি বলিল, "বরটাও বেশ ফরসা বটে, কিন্তু বউটির রঙটা যেন আরও বেশী।"

মা বলিলেন, "মেয়েছেলে, ঘষা মাজা করে, তাই অতটা দেখায়। পুরুষ মানুষকে রোদে বৃষ্টিতে ঘুরতে হয়, নইলে ওর চেয়ে ছেলেটিই বেশী ফরসা।"

মেয়ে হাসিয়া বলিল, "তবে যে তুমি বল্লে অতশত দেখ নি ? বউটি কিন্তু বেশ ভাল মানুষ, নয় মা ?"

মা কহিলেন, "তা কী করে বলব বাছা, এক দণ্ডের দেখা, কার মনে কী আছে কিছু কি বলা যায়।"

গন্তব্য ষ্টেশন আসিল প্রায় অপরাহ্নের শেষে। গাড়ী প্লাটফর্মের ভিতর ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শিবেন্দু চিৎকার করিতে লাগিল, "অশোক, অশোক।"

প্লাটফর্মের অপর প্রান্ত হইতে ট্রেণের বিপরীত মুখে আসিতে আসিতে শ্যামবর্ণের এক যুবক ডাকিল, "শিবু, শিবু।"

গাড়ী থামিলে দুই বন্ধু যখন স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক, বিছানা ইত্যাদি নামাইতে ব্যস্ত, ততক্ষণে মাধুরী নামিয়া চশমা-পরা মা ও মেয়ের সহিত গল্প করিল। বাড়ীর নাম বলিয়া তাঁহাদের বার বার নিমন্ত্রণ করিল যেন কাশী যাইবার আগে যে দুইদিন সে এখানে আছে, ইহারই মধ্যে তাঁহারা একদিন তাহাদের বাড়ীতে আসেন। বলা বাহুল্য ঠিক এই নিমন্ত্রণ মাধুরীরও মিলিল।

মা ও মেয়ে এখানকার বাসিন্দা বলিলেও হয়। মা স্থানীয় মেয়েস্কুলের শিক্ষকতা করেন, মেয়ে কলিকাতার হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে। তাঁহারা একা ভ্রমণে অভ্যস্ত। কুলী ডাকিয়া মোট-ঘাট উঠাইয়া আগেই চলিয়া গেলেন। যাইবার আগে আর এক দফা নিমন্ত্রণের আদান-প্রদান হইল।

মালপত্র নামাইয়া শিবেন্দু ষ্টেশনের বাহিরে গরুরগাড়ী ঠিক করিতে গেল। অশোক বাক্স বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ছোট ষ্টেশন, যাত্রী বেশী নামে নাই। যে কয়জন নামিয়াছিল, তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার পর পানি-পাঁড়ে তাহার

জলের বালতি লইয়া অদৃশ্য হইল। ষ্টেশনের ছোটবাবু যে দুই চারখানি টিকিট পাইলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অফিস-ঘরে ঢুকিলেন। তাহারা দুইজন ছাড়া ষ্টেশন প্রায় জনশূন্য। ঘুরিয়া ফিরিয়া অশোকের দৃষ্টি কেবলই মাধুরীর মুখের উপর পড়ে।

শেষ অপরাহ্নের রৌদ্রে মাধুরীর উজ্জ্বল গৌর বর্ণ রক্তিমাভ দেখাইতেছে। মেঠো হাওয়ার তাড়নায় চূর্ণ কুন্তল সেই রক্তিম মুখের আশে-পাশে উড়িয়া পড়িতেছে। সারাদিনের শ্রান্তি ও রৌদ্রের উত্তাপ সেই সুন্দর মুখকান্তিতে একটা শুষ্ক ম্লান শ্রী দান করিয়াছে, যাহা দেখিলে স্নেহময় চিত্তে মায়া জাগে, প্রেমময় চোখে মোহ লাগে এবং সেই শুষ্ক কোমল মধুর মুখখানিকে অঞ্জলি ভরিয়া ধারণ করিবার জন্য প্রেমিক জনের দুইটী হাত লুব্ধ হয়।

পথের বন্ধুদের বিদায় দিয়া মাধুরী এদিকে আসিল। অশোক বলিল, "এইবার কী হয়? বড্ড যে লিখেছিলে আর কখনো জন্মেও দেখা হবে না?"

মাধুরী বলিল, "না, লিখবে না। একখানা চিঠি লিখলে জবাবের জন্যে হন্যে হতে হয়। কী করে, কত কষ্টে, কত লুকিয়ে যে চিঠি লিখি, আর চিঠির জবাব না পেলে কী রকম যে কষ্ট হয় তা তো জানো না।"

মাধুরীর কষ্টের কথা শুনিয়া অশোক অতি হৃষ্টচিত্তে বলিল, "না, তা আর কী করে জানব বল? আমার তো আর কখনো ও-রকম হয়নি। আমাদের বুক যে পাথরের তৈরী।"

মাধুরী বলিল, "তাই তো, পাথরের তৈরীই তো। যে পাষাণ প্রাণ, তার বুক পাথরের নয় তো কী?"

অশোক বলিল, "কিন্তু ঘা খেলে পাথরই ভাঙ্গে।" বলিয়া এদিক-

ওদিক দেখিয়া সে খপ্ করিয়া মাধুরীর একখানা হাত ধরিয়া নিজের হৃদয়ের উপর স্থাপন করিল ও বলিল, "এই দেখ না।"

দিনের বেলায়, প্রকাশ্য ষ্টেশনে, বিশেষতঃ অদূরে শিবেন্দুর উপস্থিতিতে, এতদূর নির্লজ্জতার জন্য মাধুরী প্রস্তুত ছিল না। ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া সে কহিল, "আঃ, কী কর! মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কেউ দেখলে কী ভাববে বলত? ছিঃ।"

একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া অশোক বলিল, "ফু—উঃ, কে আছে আবার যে দেখবে?"

"বাঃ কেউ নেই। ঐ দেখ।" মাধুরী আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইল গরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানকে লইয়া শিবেন্দু আসিতেছে। মাথার কাপড় টানিয়া লজ্জিতা মাধুরী অশোকের সান্নিধ্য হইতে সরিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল ও অতি সপ্রতিভ ভাবে অশোক আর একটী সিগারেট ধরাইল।

শিবেন্দু কহিল, "বেটা ছ'আনার কমে রাজী হল না। যাক্ গে, এই রদ্দুরে, কী বল?"

মাধুরী চাপা গলায় বলিল, "বল্লুম, বেশী দূর তো নয়, হেঁটেই যাই, তা নয় আবার গাড়ী করা হল।" কিন্তু তাহার কথা না শিবেন্দু না অশোক কেহই কানে তুলিল না। গাড়ীতে মালপত্র ও মাধুরীকে তুলিয়া দিয়া দুই বন্ধু পিছনে পিছনে হাঁটিয়া চলিল।

পথ মেয়ে-স্কুলের পাশ দিয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া দেখিয়া চশমা-পরা মেয়েটী মাকে ডাকিয়া বলিল, "ও মা, ঐ দেখ, সেই বউটী যাচ্ছে।"

মা জিনিষপত্র গুছাইতেছিলেন, বলিলেন, "কে যাচ্ছে?"

মেয়ে কহিল, "এই যে আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে এল, সুন্দর বউটী।"

মা কহিলেন, "অ!"

মেয়ে বলিল, "ওমা, দেখ, ওর স্বামীর সঙ্গে আর একটী কে কালো মতন ভদ্দরলোক চলেছে, দুজনকে পাশাপাশি কী রকম দেখাচ্ছে দেখ। পড়ন্ত রদ্দুরে একজনকে যেমন ফরসা দেখাচ্ছে, আর একজনকে তেমনি কালো দেখাচ্ছে। বউটার কে হয় কে জানে। ও লোকটা কে মা? তুমি চেন?"

তাহার মা এখানকার সব-চিন লোক। সকলেই তাঁহাকে চিনে, তিনিও সকলকেই চিনেন। মা বলিলেন, "কে জানে বাছা, কোথাকার কে, আমার এখন ওসব দেখবার সময় নেই।"

বলিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন শ্যামবর্ণ যুবকটীকে চিনিতে পারেন কি না।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শিবেন্দু বেড়াইতে বাহির হইল। মাধুরী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল শিবেন্দু যেন দেরী না করে ও বাজারের খাবার কিনিয়া না খায়। মাধুরী এখনই চা ও জলখাবার তৈয়ারী করিবে। শিবেন্দু জানাইল সে দেরী করিবে না, মাত্র বাজারটা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে।

তখনও ভালো করিয়া সকাল হয় নাই। শিবেন্দুর বাজার ঘুরিয়া আসার অর্থ মাধুরীর জানা আছে। সংসারের কাজ শুরু করিবারও তাড়া নাই। মাধুরী বাগানে ঢুকিল।

কিছুক্ষণ পরে আঁচল ভরিয়া চামেলি ফুল সংগ্রহ করিয়া মাধুরী ধীরে ধীরে নিঃশব্দে যে ঘরে ঢুকিল, সে ঘরে তখনো অশোক নিদ্রামগ্ন।

পূবের জানালা দিয়া উষার গোলাপী আলো আসিয়া অশোকের

শ্যামবর্ণের বর্ণান্তর ঘটাইয়াছে। কোমল আলোর প্রলেপে ও সুখ-নিদ্রার আবেশে স্নিগ্ধ সেই মুখখানি শিশুর মতো সরল, নিশ্চিন্ত ও একান্ত মমতাময়রূপে প্রতিভাত হইল। বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া, মাধুরী আবিষ্ট চোখে সেই প্রিয় মুখ চুরি করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, চোখের পলক পড়ে না। বহুদিনের পর ঈপ্সিত দর্শনের নেশা তাহার কাটিতে চাহে না।

হঠাৎ বাহিরে কোথায় মালির কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার দেখার ধ্যান ভাঙ্গিল। দরজাটা খোলা রহিয়াছে। অতি সন্তর্পণে মাধুরী চলিল দরজা বন্ধ করিতে।

কেন যে মানুষের গাঢ় ঘুম এক সময়ে হঠাৎ বিনা কারণে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা বলা যায় না। সেই মুহূর্ত্তে অশোক চোখ মেলিয়া চাহিল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে সে দেখিল মাধুরী। তাহার শুভ্র মসৃণ গ্রীবার উপর শিথিল কবরী দুলিতেছে, তাহার সঞ্চারিণী অঞ্চল ভূমিতে লুটাইতেছে, শয্যাতল হইতে শুভ্র ফুলের একটী ছায়াপথ আঁকা হইয়াছে, সেই ছায়াপথের এক প্রান্তে সে, অপর প্রান্তে মাধুরী, এবং ঘরের মধ্যে একটী মন্থর মৃদু সুরভি বিচরণ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া মাধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল অশোক জাগিয়াছে। অশোকের চোখের মুগ্ধতা অনুভব করিয়া মাধুরীর চোখে মুখে একটি সলজ্জ ও সপ্রেম হর্ষের প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিয়া মাধুরীর মাধুরীকে অপরূপ করিল। প্রভাতে এই রমণীয় পরিবেশের মাঝখানে এই মোহিনী মূর্ত্তিকে অশোক শুধু দুই নয়ন মেলিয়া নহে, সারা হৃদয় মেলিয়া দেখিতে লাগিল।

তখন সেই ঘরখানি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং ঘরের

ভিতর এই দুইটি উদ্‌ভ্রান্ত নরনারীকে ঘেরিয়া সময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু বাহিরের জগতে সময়ের গতি স্তব্ধ হয় নাই। সেখানে ঊষা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে। পথে লোক চলাচল বাড়িয়াছে।

কালকের সেই মেয়েটি ও তাহার মা আসিয়া বাগানে ঢুকিলেন। মালী কোথায় ছিল, ইঁহাদের দেখিয়া আগাইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া শোনা গেল, বহুমা ঘরেই আছেন ও কাল যে বাবু আসিয়াছেন তিনি বেড়াইতে গিয়াছেন, এই রূপই মালীর মালুম হইতেছে।

দুইজনে সামনের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। এ পাশের ঘরখানি খোলা, শূন্য বিছানা পড়িয়া আছে। ও দিকের ঘরটির দরজা ভেজানো। মা ও মেয়ে সেই দিকে চলিলেন।

দরজা ঠেলিয়া মহিলা ঘরের ভিতর পা বাড়াইলেন।

পর মুহূর্ত্তে মুখ কালো করিয়া তিনি দ্রুত পিছু হটিলেন। মায়ের কাঁধের উপর দিয়া মেয়ের দৃষ্টিও ঘরের ভিতর গিয়াছিল, সেও মুখ ফিরাইয়া সরিয়া আসিল।

অকস্মাৎ বাহিরের চলমান রূঢ় জগতের সহিত ঘরের কোমল স্থির জগতের সংঘাত হইল। সেই সংঘাতে ঘরের জগৎ চূর্ণ হইয়া গেল।

সেই ঘরের জগতে যে ছেলেটি তক্তাপোষের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পরম আনন্দে একটি মেয়ের শিথিল কবরীতে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল, এবং যে মেয়েটি ভূমিতলে জানু পাতিয়া বসিয়া ছেলেটির দুই জানুর মধ্যে নিজেকে বন্দী করিয়া আনন্দে মাথা পাতিয়া সেই প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে নিজের কবরীর

প্রসাদীফুল লইয়া ছেলেটির বিস্রস্ত চুলে আটকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের দুই জনের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। তাহাদের চৈতন্য হইল পৃথিবীতে সূর্য্য উঠিয়াছে, পৃথিবীর পথে বিচারবুদ্ধিশালী মানুষ চলিতেছে ও আপাততঃ একটি বিচক্ষণ মানুষ প্রবীণা শিক্ষয়িত্রীর রূপ ধরিয়া তাহাদের অতি কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে।

চকিতা মাধুরী মাথার কাপড় টানিতে টানিতে মুখ লাল করিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, অতিথিরা দালান ও রক পার হইয়া বাগানে নামিতেছেন। সে দ্রুতপদে পিছনে আসিয়া জোড় হাতে নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন আসুন, এত শীগগির যে পায়ের ধূলো দেবেন আশা করতে পারিনি।"

তাহার এত যত্নের নমস্কার কেহই গ্রাহ্য করিল না। শিক্ষয়িত্রী কথা কহিলেন না, গম্ভীর মুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মেয়ে মাধুরীর মাথার পুষ্পালঙ্কারের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "আহা, আশা কর নি না আশঙ্কা করনি ?"

সেই সময়ে তোয়ালে কাঁধে ও টুথ-ব্রাস হাতে, সেই কালো ছোকরাটা, তখনো তাহার চুলে দুই একটি ফুল আটকাইয়া আছে, তাঁহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। দুই জোড়া চশমায় ঢাকা তীব্র দৃষ্টি সেই কালো পিঠখানার উপর নিবদ্ধ হইল। মায়ের চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা, মেয়ের চোখে ঘৃণা না হোক বিস্ময় ফুটিল, ভাবিল কোথায় সেই সোণার কার্ত্তিকের উজ্জল রূপ, আর কোথায় এই দুস্কৃতের কালো বরণ! ছি ছি কী পছন্দ !

মাধুরী হাসিমুখে আসিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া বলিল, "বাগানে বসবেন ? কিন্তু রোদ উঠে গেছে, ঘরে বসলে হতো না ? একটু চা, টা—"

মেয়েকে উত্তর দিতে হইল না। তাহার মুখ খুলিবার আগেই তাহার জননী পিছন ফিরিয়া তাঁহার সব চেয়ে শিক্ষয়িত্রী-জনোচিত সুরে কহিলেন, "সুনীতি, চলে এসো। তোমাকে কতবার বলে দিয়েছি, অজানা লোকের সঙ্গে মেশামেশি করা আমি পছন্দ করি না।"

সুনীতি চুপ করিয়া রহিল। সে শিষ্ট ও সভ্য মেয়ে বলিল না যে, তিনিই তো রাত পোহাইতে না পোহাইতে উঠিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন কালকের বৌটির বাড়ী বেড়াইতে যাইবার জন্য।

মাধুরী বিশ্বাস করিতে পারিল না সুনীতির মায়ের কথার অর্থ। তাহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া, তাহারই সহিত দেখা করিতে আসিয়া, তাহাকেই মিশিবার অযোগ্য বলিতে পারা যায় কি কারণে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আসিল না।

সে আগাইয়া আসিয়া মূঢ়ের মত মা ও মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এসেই চলে যাচ্ছেন? কেন?"

সুনীতির জননী মনের জ্বালা দূর করিবার জন্য এই সুযোগটুকুই চাহিতেছিলেন। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নাকের উপর চশমা ঠেলিয়া দিয়া তিনি অগ্নিময় ভাষায় সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

•

মুখ ধুইয়া আসিয়া অশোক দেখিল মাধুরী তাহার ঘরে টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। অনেক সাধ্য সাধনায় সে অভ্যাগতের হাতে মাধুরীর লাঞ্ছনার কথা শুনিল। কয়েক মুহূর্ত অবাক হইয়া থাকিয়া অশোক হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাধুরী বিস্ময়ে ও রাগে মাথা তুলিয়া বলিল, "তুমি হাসছ কী বলে?"

অশোক হাসিতে হাসিতেই বলিল, "বাঃ, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু আছে? এই বিদেশে অন্ততঃ দুটি মানুষও রইল, যারা তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছে। তোমার ঐ সুনীতি আর তার মাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে।"

মাধুরী ক্রোধে আরক্তমুখে বলিল, "ঐ বুড়ীর আমি মুখ দেখব আবার? এমন কথা বলে আমাকে? বল্লুম উনি আমার স্বামী, তা বলে কি না, আর সেই কালকের স্বামীটি? কোথায় গেলেন? ঝঁ্যাটা মারো, ঝঁ্যাটা মারো, ঘরে একটা, পথে একটা—"

অশোক হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। বলিল, "ঝঁ্যাটা মারো বল্লেন? বাঃ, বাঃ, দেখেছো মাধুরী, ইস্কুল মাষ্টারই হোন আর উচ্চ শিক্ষিতাই হোন, মূলতঃ বাঙ্গালীর মেয়ে তো। রেগে গেলে নিজের ভাষাই বেরিয়ে পড়ে। সেই গোপাল ভাঁড়ের 'সঁড়া অন্ধা'র মতো।"

মাধুরী বলিল, "থামো। নিজের স্ত্রীকে এতবড় অপমান ক'রে গেল আর তুমি হেসে গড়িয়ে পড়ছ? তোমার লজ্জা করে না?"

অশোক হাসি থামাইয়া বলিল, "আমার নিজের স্ত্রীকে অন্য লোকে পরস্ত্রী বলে মনে করেছে, এতে আমার লজ্জার কী আছে? আর সত্যি বাপু, তাঁরই বা দোষ কী? তুমি সারা দিনটা তোমার শিবুদার স্ত্রী সেজে এলে—"

মাধুরী ভেংচাইয়া কহিল, "সেজে এলে! তুমি কেন আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এলে না?"

অশোক চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "বাঃ, তখন কোথায় বাড়ী কোথায় কী তার ঠিক নেই।"

মাধুরী কহিল, "নেই তো নেই। আমার এমন রাগ হচ্ছে।—

ছি ছি ছি।” তাহার মনে পড়িল বর্দ্ধমান ষ্টেশনে চেকারের মন্তব্য। সে আবার কহিল, “ছি ছি ছি।”

অশোক কহিল, “এখন ছি ছি করলে কী হবে, তখন তো শিবুদার বউ সাজতে—”

মাধুরী ঝাঁঝিয়া বলিল, “ফের বলছ ঐ কথা? আমি সাজলুম, না তুমি সাজালে? তুমিই তো তোমার ক'টা টাকা বাঁচাবার জন্যে শিবুদাকে লিখলে—”

লজ্জায় মাধুরী কথা শেষ করিতে পারিল না। অশোক কহিল, “আমি না হয় লিখলুম, কিন্তু তোমরা দু'টীতে তো রাজী হ'য়ে গেলে। মনে করলে, খোস খবরের ঝুটোও ভালো, কী বল?”

মাধুরী অতিরিক্ত রাগে কথা কহিল না। অশোক বলিল, “তা সত্যি, শিবুদার চেহারার কাছে কি আমি? আর সেকেণ্ড কাজিনে দোষও নেই। অর্জ্জুন আর সুভদ্রার কথাই ধর না।”

মাধুরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল “কী ছোট-লোকের মত ঠাট্টা যে কর, আমি কালই চলে যাবো।”

অশোক গম্ভীর ভাবে চুলে বুরুশ ঘষিতে ঘষিতে বলিল, “তা বটে, এখনো শিবুর সেল্‌ফ্ এণ্ড ওয়াইফ্ পাশটা আছে। কিন্তু শিবুর বদমাইসিটা দেখো, ওটা ওরকম পাশ না নিয়ে উইডোড্ সিস্‌টার বলে পাশ নিলেও তো পারতো। তাতে সম্পর্কটা বাঁচতো। তবে হ্যাঁ তোমাকে ক' ঘণ্টার জন্যে হাত দুটো খালি করতে হ'ত আর সিঁথেটা—”

মাধুরী চেয়ার উল্টাইয়া, অশোকের হাতের বুরুশ কাড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অশোক চিৎপাত হইয়া বিছানায় পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

'ছি-ছি' শুধু মাধুরীই বলিল না। শিবেন্দুও বলিল, 'ছি-ছি-ছি'। এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিল, চাকরীর দৌলতে সে বিধবা মা, বোন, অরোজগারী ভাই সাজাইয়া অনেককেই নিখরচায় দেশভ্রমণ করাইয়াছে, কিন্তু 'সস্ত্রীক' পাশ লওয়া এই শেষ, যতদিন না নিজের বিবাহ হয়। ছি-ছি, সহোদরা না হইলেও বোন তো বটে।

আর "ছি-ছি" করিলেন সুনীতির মা।

কথা ছিল মাত্র অশোকের জন্য একটা টিকেট কাটিয়া লইয়া তাহারা তিনজন কাশী বেড়াইয়া আসিবে। কিন্তু মাধুরী বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশোক প্রস্তাব করিল 'পাশ' না হয় তাহার কাছেই থাকিবে, শিবেন্দু টিকিটটা লইবে। কিন্তু মাধুরী বলিল পাশ অশোকের হাতে থাকিলেও তাহাতে নাম তো শিবেন্দুরই থাকিবে। এ লজ্জাকর ব্যবস্থায় সে আর মরিয়া গেলেও রাজী নয়। অগত্যা শিবেন্দুকে একাই যাইতে হইল।

পরদিন বৈকালে তাহাকে কাশীর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় অশোক কোনও আপত্তি শুনিল না। সস্ত্রীক সুনীতিদের বাসায় ঢুকিল। ইহাদের এই দুঃসহ নির্লজ্জতার স্পর্দ্ধায় প্রথমটা সুনীতি ও তাহার মায়ের যেমন বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, মিনিট পাঁচ ছয় পরে তাঁহাদের লজ্জা ও অনুতাপ রাখিবারও তেমনি ঠাঁই মিলিল না। প্রচুর আদর যত্ন আপ্যায়ন করিয়াও এবং বারম্বার ক্ষমা চাহিয়াও সুনীতির মায়ের মনের গ্লানি দূর হইল না। তিনি বারম্বার বলিলেন 'ছি-ছি-ছি'।

(বঙ্গশ্রী—শ্রাবণ ১৩৪৯)

বিবাহের দিন

আজ আবার সেইদিনটি আসিয়াছে।

সকাল হইতে প্রিয়নাথ লক্ষ্য করিতেছিল কখন কর্ত্তাকে একাকী পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সকালের দিকে দোকানের কাজ একটু মন্দা থাকে, বৈকালে অফিসের বাবুদের ফিরিবার সময় হইতে রাত আটটা পর্য্যন্ত বিক্রয়ের বাহুল্য। তাহা ছাড়া, সন্ধ্যার পর হিসাবের চাপ এত বাড়ে যে প্রিয়নাথের মাথা তুলিবার সময় থাকে না। খরিদ্দার ও মহাজনের ভিড়ে সে সময়টা দোকানের মালিকেরও সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়। এইসব কারণেই কাল কথাটা বলি বলি করিয়াও প্রিয়নাথ বলিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার উপর কাল কী একটা হিসাবের ঝঞ্চাটে কর্ত্তার মেজাজও সুপ্রসন্ন ছিল না।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া প্রিয়নাথ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিল আজ সে বলিবেই। প্রায় তিন মাস কাজ করিতেছে, একদিন কামাই নাই, আজ এইটুকু অনুগ্রহ সে আদায় করিবেই, কর্ত্তার মেজাজ যেমনই থাকুক।

কিন্তু কর্ত্তার মেজাজ আজ ভালোই মনে হইল। মুখে কয়েকবার হাসিও দেখা গিয়াছে। এমন কি, মুরলী বলিয়া যে ছোকরাটি কাপড়ের দাম বলিতে প্রায়ই ভুল করে ও বকুনি খায়, তাহাকে কী কথা বলিতে বলিতে কর্ত্তা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়াও ছিলেন। পরে

এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রিয়নাথ জানিল,মুরলী গোটা আষ্টেক টাকা মাহিনা বাবদ অগ্রিম চাহিয়াছিল। মুরলীর বিবাহ হইয়াছে বেশী দিন নয়। মাহিনার টাকা আজকাল আর কোনও মাসের শেষেই তাহার পুরা মেলে না। অগ্রিম তো মঞ্জুর হইয়াছেই, বরং মুরলীর বিবাহের পর হইতে খরচ বেশী হইবার কথার সূত্রে কর্ত্তা পরিহাসও করিয়াছেন। মুরুলী হাসিয়া বলিল—"বুড়ো রসিক আছে, বুঝলেন? তবে লোক ভালো, কী বলেন প্রিয়নাথ-দা ?"

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। লোক সত্যই মন্দ নহেন। মেজাজ ভালো থাকিলে কর্ম্মচারীদের সুখ দুঃখের কথায় কান দিয়া থাকেন। দুপুরের কিছু আগে, এক সময় একলা পাইয়া প্রিয়নাথ তাহার আর্জ্জি পেশ করিল। এমন কিছু বাড়াবাড়ির আর্জ্জি নয়। তবু প্রিয়নাথের মনে সঙ্কোচ ও সংশয় দুই-ই ছিল।

কিন্তু তাহার আর্জ্জিও মঞ্জুর হইয়া গেল। কর্ত্তা শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তো শনিবার নয়, প্রিয়নাথবাবু, এমন বে-বারে বাড়ী যাবে কেন হে ?"

মফঃস্বলের লোক সাধারণতঃ শনিবারেই বাড়ী গিয়া থাকে, সেই ধারণামতই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ কবে দেশে যায় না যায়, তাহার খবর অবশ্য তিনি রাখিতেন না।

প্রিয়নাথ পরিষ্কার জবাব দিতে পারিল না। আজ তাহার বিবাহের বার্ষিকী, একথা এই বুড়া বয়সে বলিতে পারা শক্ত, বলিলেও ভালো শুনাইত না। মাথা চুলকাইয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু বিশেষ আবশ্যক হয়েছে।" তারপর মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি কালই আসব।"

—"তা এসো, দরকার অদরকার মানুষের আছেই। আচ্ছা।" কর্তা প্রসন্নমুখেই অনুমতি দিলেন।

রাত্রি নয়টার আগে দোকানের ছুটী মেলে না। সেই জায়গায় ছ'টার সময় ছুটী পাওয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ। প্রিয়নাথ আসনে ফিরিয়া আসিয়া খেরো বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইল।

কিন্তু হিসাব তাহার মাথায় আসিল না। খাতার পাতায় সে যে তারিখটি কী আজ সকালে আসিয়া ফাঁদিয়াছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া মন তাহার একুশ বৎসর পিছাইয়া গেল। অথচ একুশ বৎসর পূর্ব্বের সেই দিনটিতে আর আজিকার এই দিনটিতে কোনও দিক দিয়াই কোনও সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র এই তারিখের মিল ছাড়া। সেদিনের রক্তমাংসের হৃদয় আজিকার শুষ্ক হৃদয় নয়; সেদিনের চঞ্চল জগৎ আজিকার স্থবির জগৎ হইতে সহস্রযোজন দূরে সরিয়া গিয়াছে; সেদিনের প্রিয়নাথ আজিকার প্রিয়নাথকে দেখিলে চিনিতে পারিবে না।

নিজের কলমধরা হাতখানার দিকে চাহিয়া প্রিয়নাথের মনে হইল এই শিরা-বহুল, শীর্ণ, কুশ্রী হাত পাতিয়াই একদিন যে সে একটি পরম সম্পদ লাভ করিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বাস হয়! ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সে কলম দোয়াতে ডুবাইয়া লইয়া লিখিবার উদ্যোগ করিল।

মুরলী বলিল—"ও প্রিয়নাথ দা—"

প্রিয়নাথ চমকিয়া বলিল—"য়্যাঁ?"

মুরলী বলিল—"কী ভাবছেন বলুন তো? বার দশেক কলমে কালি নিলেন, কিন্তু একটা আঁচড়ও তো কাটেন নি। বসে বসে দেখছি তাই আপনার মজাটা। কী ভাবছেন এত?"

প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত হইয়া দোয়াতে কলম ডুবাইতে ডুবাইতে বলিল —"না, কিছু ভাবিনি, এমনিই।"

মুরলী বলিল—"আমি বল্‌ব কী ভাবছিলেন?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় দিল—"শুনলুম বাড়ী যাবেন। নিশ্চয়ই বৌদির কথা ভাবছিলেন, ঠিক কি না বলুন?"

প্রিয়নাথ বলিল—"না, ঠিক যে সেইকথাই ভাবছিলুম তা নয়— তবে, হ্যাঁ, তা-ও বটে।"

মুরলী হাসিয়া বলিল—"কী রকম ধরেছি বলুন? য়্যাঁ?"

খরিদ্দার আসিয়া পড়াতে মুরলীর আলাপে বাধা পড়িল। প্রিয়নাথ পুনরায় কলমে কালি লইয়া খাতায় মন দিবার চেষ্টা করিল।

তিনটার পর প্রিয়নাথ খাতা বন্ধ করিয়া কী ভাবিল। তারপর মুরলীকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"একখানা লালপাড় শাড়ী কত পড়বে, মুরলী?"

মুরলী জিজ্ঞাসা করিল—"নক্সা পাড়, না প্লেন?"

প্রিয়নাথ কহিল—"ধর—যদি নক্সা পাড়ই হয়? তাহলে—"

—"তাহলে সাড়ে তিন—চার এই রকম হবে আর কি?"

—"জোড়া?"

মুরলী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"জোড়া! জোড়া আপনাকে দিচ্ছে। একখানা দাদা, একখানা। আর কি সেদিন আছে?"

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—"নাঃ, ও নক্সা পাড় থাক ভাই, তুমি একটা প্লেন-পাড়ই দাও, টাকা দুয়েকের মধ্যে।"

মুরলী অন্তরঙ্গের মতো কানের কাছে মুখ আনিয়া গলা নামাইয়া

জিজ্ঞাসা করিল—"বৌদির জন্যে তো? না দাদা, সে আমি পারব না। আজকালের এই এত রঙবেরঙের পাড়ের যুগে আমি প্লেন-পাড় শাড়ী দিয়ে গালাগাল খেতে পারব না। আপনাকে নক্সা-পাড়ই নিতে হবে।"

বলিয়া প্রিয়নাথকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া গেল এবং বাছিয়া বাছিয়া একখানি লাল নক্সাপাড় শাড়ী আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এই নিন্, দেখুন, কী চমৎকার ডিজাইনটী করেছে", এবং আবার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"কারুকে বলবেন না দাদা, গত হপ্তায় এরই একখানি নিয়ে গেছি। তা, আপনার বৌমা একেবারে ড্যাম্‌গ্ল্যাড্।"

পাড়টি মনোহর বটে। প্রিয়নাথ দেখিতে দেখিতে বলিল—"কিন্তু —এর তো অনেক দাম হবে। না, এ তুমি রেখে দাও, বরং—"

মুরলী ওস্তাদ দোকানদারের ভঙ্গীতে বলিল—"দামের কথা থাক্ না দাদা, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন না। এতদিনের মধ্যে কখনো তো একটা শাড়ী কিনতে দেখলুম না; নিয়ে যান, নিয়ে যান, দেখ্‌বেন বৌদি কী রকম খুশী হন। আর অমনি বল্‌বেন যে তাঁর মুরলী ঠাকুরপো বেছে পছন্দ করে দিয়েছে।"

মুরলীর কথা শুনিয়া অতি দুঃখেও প্রিয়নাথের হাসি পাইল। তাহার বৌদিদির জন্য এই আর্ত্তি দেখিলে কে বলিবে যে মুরলী তাহার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু নয়। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও ছোকরা বোধহয় জানিতই না প্রিয়নাথের বিবাহ হইয়াছে কি না।

মুরলীর আত্মীয়তার কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাহার অভয়দান সত্ত্বেও প্রিয়নাথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কাপড়

তো চমৎকার, কিন্তু এত টাকার মানুষ তো আমি নই ভাই। তাই বলছিলুম, না হয়—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া মুরলী বলিল—"এত টেত কিছু নয় দাদা, এত টেত কিছু নয় ; সস্তায় হবে—মানে, একটু—সে কিস্যু নয়—অতি সামান্য একটু দাগী আছে। তাই মোটে দু'টাকা সাড়ে তেরো আনা দাম ফেলা আছে। তা সেও তো বাইরের লোকের দাম। আর তাছাড়া আপনাকে তো আর এক্ষুণি দাম দিতে হচ্ছে না। নিয়ে যান, বুঝলেন, সুবিধে আছে।"

বলিয়া মুরলী একটি চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া এক রহস্যময় সুবিধার ইঙ্গিত করিল। প্রিয়নাথ কহিল—"না, না, আমি নগদ্ দাম দোব, ও লেখাতে টেখাতে হবেনা।" সে চুপি চুপি দুইটাকা সাড়ে তেরো আনা মুরলীর হাতে গণিয়া দিয়া বলিল—"কারুকে বল্‌বার দরকার নেই। কাপড়টা তুমি একটা কাগজে মুড়ে রেখে দাও, যাবার সময় নিয়ে যাব। আর টাকাটা একসময় জমা করে দিও, বুঝলে ?"

কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া প্রিয়নাথ যে অপর সকলের থেকে তাহাকে পৃথক করিয়া দেখিল, ইহার মর্য্যাদায় মুরলী খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"সে আর আমাকে বলতে হবে না। আর, আমি একটা ক্যাশমেমোও করিয়ে রেখে দোব। কী জানি বেরোবার সময় যদিই কেউ কিছু বলে' বসে। তখন আপনি যতই বলুন নগদ দাম দিয়ে কিনেছেন, অথচ দোকানেরই লোক হয়ে, কেউ বিশ্বাসই হয়তো করবে না।"

ছয়টার সময়ে ছুটী মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু উঠিতে উঠিতে প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল। কটায় ট্রেণ ছাড়িবে তাহা জানা নাই, তবে

এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের ফিরিবার সময়, গাড়ীর অভাব হইবে না এরূপ আশা আছে। মুরলীর নিকট হইতে কাগজে মোড়া শাড়ীখানি লইয়া প্রিয়নাথ বাহির হইয়া পড়িল।

পাশেই বাজার। প্রিয়নাথ বাজারে ঢুকিল। বাহির হইয়া সামনেই দেখে সেই মুরলী। মুরলী চা খাইতে বাহির হইয়াছে। সাবধান হইবার সময় পাওয়া গেল না। মুরলী তাহার হাতের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—"কী প্রিয়নাথদা, ফুল কিনলেন নাকি?"

কলাপাতার মোড়ক, দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া মোড়কের কোণে কোণে ফুল উঁকি মারিতেছে। সুতরাং মুরলীর প্রশ্নের উত্তর দিবার দরকার করে না। উত্তর দিবার ইচ্ছাও প্রিয়নাথের ছিল না। মুরলীর কাছে ধরা পড়িয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি ফুলের মোড়কটি পকেটে পুরিল।

মুরলী আবার বলিল—"কি ফুল কিনলেন, দেখি?"

প্রিয়নাথের দেখাইবার ইচ্ছাও ছিল না। সে কহিল—"ও এমন কিছু নয়। এই সামান্য—"

প্রিয়নাথের স্বাভাবিক নিস্পৃহ নীরবতার জন্য এতদিন তাহার সম্বন্ধে মুরলীর কোনও কৌতূহলই হয় নাই। আলাপও সাধারণ পরিচয়ের বেশী এগোয় নাই। অন্তরঙ্গ আলাপ হইবার কথাও নয়। দুইজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানও যত বেশী, প্রকৃতিগত পার্থক্যও তেমনি সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ স্ত্রীর জন্য নক্সাপাড় শাড়ী কিনিয়া—যে শাড়ীর জোড়া মুরলীর তরুণী স্ত্রী ব্যবহার করিতেছে—প্রিয়নাথ যেন মুরলীর সম-পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। নব-বিবাহিত যুবক মুরলী, একুশ

বৎসর পূর্ব্বে বিবাহিত, যৌবন-সীমান্তের প্রিয়নাথকে বন্ধুর মতোই জ্ঞান করিল।

কুণ্ঠিত প্রিয়নাথকে ভরসা দিয়া মুরলী বলিল—"ও কথা বলবেন না প্রিয়নাথদা, ফুলের আবার সামান্য আছে নাকি? দেখি, দেখি।"

তথাপি প্রিয়নাথের দেখাইবার গা নাই দেখিয়া সে বলিল—"অবিশ্যি আমি ছুঁলে যদি কিছু আপত্তি থাকে তো থাক্। মানে, সত্যনারাণ-টত্যনারাণ নয় তো?"

অগত্যা প্রিয়নাথকে বলিতে হইল—সত্যনারায়ণ কিম্বা অন্য কোন দেবতার পূজার জন্য এ ফুল নহে এবং দেখাইতে যে আপত্তি নাই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সে বিষম আপত্তি সত্ত্বেও পকেট হইতে ফুলের মোড়কটি বাহির করিয়া দিল।

মুরলী দেখিয়া বলিল—"বাঃ বাঃ, চমৎকার মালাটি কিনেছেন তো।" ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মালাছড়াটি দেখিয়া ও তাহার আঘ্রাণ লইয়া মুরলী তাহা কলাপাতায় মুড়িয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"পূজোর জন্যে নয়, তবে কার জন্যে দাদা? বলতেই হবে।" তাহার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ-বয়সের এই পাগলামির, এই অর্থহীন সৌখীনতার কথা কাহাকেও বলা যায় না, মুরলীকে তো নয়ই। ছেলেমানুষের মতো এখনই না বুঝিয়া যা তা বলিতে থাকিবে। প্রিয়নাথ অপ্রতিভ মুখে চুপ করিয়া রহিল।

তাহার এই সলজ্জ সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া মুরলী আপন প্রখর বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অনুমান করিয়া লইল এই মালা কাহার জন্য। মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রিয়নাথের লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া মুরলী বলিল

—"বোধহয় বুঝতে পেরেছি কার জন্যে। কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি বয়োবৃদ্ধ লোক, বলছি কি, আজকের শাড়ী আর ফুলের মালার যোগাযোগের কিছু কি বিশেষ কারণ আছে? অবিশ্যি যদি বলতে আপত্তি না থাকে।"

আপত্তি অতি গুরুতর রকমই ছিল। এ সকল গল্প করিবার কথা নয় এবং মিথ্যা কিছু একটা বলিয়া চলিয়া গেলেও হইত, মুরলী বিশ্বাস করুক আর নাই করুক। কিন্তু আজিকার দিনটির সম্বন্ধে মিথ্যা কহিলে এই দিনটিকেই অস্বীকার করা হয়, প্রিয়নাথের ইহাই মনে হয়। এইজন্যই মুরলীর পীড়াপীড়িতে প্রিয়নাথকে অনিচ্ছার সহিত বলিতে হইল—আজ তাহার বিবাহের তারিখ ও সেই উপলক্ষেই এই শাড়ী ও ফুলের সমাবেশ। ইহার বেশী সে বলিল না। যদিও ইহাতে মুরলী ঠিক বুঝিবে না, তথাপি প্রিয়নাথ নিজের কাছে নিজেকে খাঁটী রাখিল। যে দিনটি তাহার জীবনের পরম স্মরণীয় দিন, সেই অনন্য দিনটিকে সে অপরের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিতে চায় বটে, কিন্তু যদি কেহ স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তবে ইহাকে মিথ্যার আবরণে ঢাকা দিতেও সে রাজী নয়, অস্বীকার করিয়া ইহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেও সে পারে না।

মুরলী বলিল—"Weddins day! বাঃ বাঃ! পায়ের ধূলো দিন দাদা, আপনার প্রতি এতদিন ঘোর অবিচার করেছি। শুষ্কং কাষ্ঠং বাইরেটা দেখে ভেতরের রসিক পুরুষটিকে চিনতে—"

ট্রেনের সময় হইয়া যাইতেছে জানাইয়া প্রিয়নাথ বিদায় তাড়াতাড়ি লইল। মুরলী চোখ বড় করিয়া চলন্ত প্রিয়নাথের পিঠের উপর মুগ্ধ দৃষ্টি পাতিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেশের ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিতে প্রিয়নাথের রাত হইয়া গেল। ট্রেণ না জানা থাকায় হাওড়ায় আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অত দেরীতে পল্লীগ্রামের ষ্টেশনে বেশী লোক আসে না। প্রিয়নাথ একাকী গ্রামের পথে অগ্রসর হইল।

শেষা শুক্লপক্ষের রাত্রি। পূবদিকের গাছের মাথার উপর প্রায় পূর্ণ চাঁদ। ধূসর কঠিন মাঠের উপর স্নিগ্ধ আলো পড়িয়া তাহার কাঠিন্য চাপা পড়িয়াছে। কর্কশ মাটীর ফাটল ডুবাইয়া সমস্ত মাঠটির উপর একটি তরল কোমলতার পুলি পড়িয়াছে। প্রিয়নাথ জেলা-বোর্ডের পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের আলের পথে নামিল।

এ পথে তাহার বাড়ী পৌছিতে সময় কম লাগে। বিবাহের পর একবার বিদেশ হইতে আসিবার সময়, অন্ধকার রাত্রে বর্ষার এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া এই মাঠের পথে সে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ীতে পৌছিয়া ইহার জন্য নববধূ মালতীর কাছে তাহার অনেক তিরস্কার লাভ ঘটিয়াছিল। তিরস্কার জলের জন্য নহে; মাঠের জলে ধানক্ষেতে সাপ ভাসিয়া বেড়ায়; তাহাদের গায়ে পা পড়িলে তাহারা ছাড়িয়া কথা কহিত না, অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই বলিলে ক্ষমাও করিত না। সাপকে মালতীর বড় ভয় ছিল।

মালতী রাগ করিয়া বলিয়াছিল—"পাকা রাস্তায় এলে চল্‌ত না? কেন, এতই কিসের তাড়া?"

প্রিয়নাথ হাসিমুখে উত্তর দিয়াছিল—"কিসের তাড়া জানো না? কার জন্যে ছুটে ছুটে আসি, বলব?"

গুরুজনের ভয়ে মালতীর গলা চড়াইবার উপায় ছিল না। চাপা গলায় ঝঙ্কার দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, আর

বল্‌তে হবে না, খুব হয়েছে। কিন্তু দশ মিনিট পরে এলে সে তো আর পালিয়ে যেতো না।" কিন্তু ঝঙ্কারে তাহার রাগের সুর ফোটে নাই, ফুটিয়াছিল একটি পরিতৃপ্ত অনুরাগ ও সলজ্জ আনন্দের সুর।

কৃত্রিম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের স্বরে প্রিয়নাথ বলিয়াছিল—"কী জানি বাপু, যদিই পালিয়ে যায়! সেই ভয়েই তো কোথাও গিয়ে টিকতে পারি না।"

সত্যই তখন তখন প্রিয়নাথ গ্রাম ছাড়িয়া নড়িতে চাহিত না।

আজ অবশ্য বধূর পলাইবার ভয় আর নাই। তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই, শুধু অভ্যাসবশেই প্রিয়নাথ মাঠের পায়ে-চলা পথ ধরিল।

অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ আলের ধারে পা পড়িয়া পা পিছ্‌লাইয়া গেল। প্রিয়নাথ পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। তাহার বাহুমূল হইতে নূতন শাড়ীর মোড়কটি খসিয়া পড়িল। সেটি উঠাইয়া লইয়া ধূলা ঝাড়িয়া প্রিয়নাথ সাবধানে চলিল। এতক্ষণ হাতে হাতে কাপড়ের উপরের কাগজটি স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শাড়ীর টকটকে লালপাড়ের নক্সা চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রিয়নাথের কাপড়টি সত্যই পছন্দ হইয়াছিল।

একবার, সেবারই বোধহয় তাহাদের প্রথম বিবাহ-তিথি, প্রিয়নাথ একখানি চওড়া লালপাড় শাড়ী কিনিয়া লুকাইয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছিল। তখন এত বিচিত্র পাড়ের, এত লতাপাতার নক্সার চলন হয় নাই। মালতী সব পাড়ের চেয়ে লাল পাড়ই বেশী পছন্দ করিত। আর শুধু মালতীর পছন্দ বলিয়াই নহে, প্রিয়নাথের চোখেও মালতীর সুন্দর মুখশ্রী ঘোর লাল রঙের বেষ্টনীর মধ্যে যেমন শোভা পাইত এমন আর কোনও মূল্যবান ঝক্‌ঝকে শাড়ীতেও পাইত না।

গভীর রাত্রে, বাড়ী নিস্তব্ধ হইলে, নিদ্রালু প্রিয়নাথকে এই শখের দাম দিতে হইয়াছিল। মালতীর নির্ব্বন্ধে ঘুমভরা চোখে তাহাকে খাট হইতে নামিয়া মাটিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল দুইটি পা জোড় করিয়া এবং মালতী বাহিরে গিয়া সেই নূতন শাড়ী পরিয়া আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার জোড়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। কী তাহার প্রণামের ভঙ্গী! আর সেই সাদাসিধা লালপাড়েরই বা কী মাধুর্য্য! আঁচলটি ঘাড়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া মাটীতে পড়িয়াছে, ছোট মাথাটি প্রিয়নাথের পা দুইটি ঢাকিয়া দিয়াছে, পায়ের উপর সেই অনুপম মুখখানির কোমল উষ্ণ স্পর্শ লাগিল। নির্ব্বাক প্রিয়নাথ সেই নিঃশেষ আত্ম-নিবেদনের মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রণতা মালতীকে পায়ের উপর হইতে তুলিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

চাঁদের আলোয় নিজের জীর্ণ জুতাপরা মলিন পায়ের দিকে দেখিতে দেখিতে প্রিয়নাথ চলিতে লাগিল। নূতন শাড়ীটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ভাবিল, চিত্র বিচিত্র অনেক হইল, সৌন্দর্য্য তাহাতে হয়তো বাড়িলই, কিন্তু অলঙ্কারের আড়ম্বরহীন শান্ত লালপাড়ের সে মহিমা আর ফিরিয়া আসিবে না!

তাহাদের বাড়ীর আগে নবীন গাঙ্গুলীর বাড়ী। গাঙ্গুলী মহাশয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। পদশব্দ পাইয়া নবীন গাঙ্গুলী হাঁকিলেন—"কে যায় ?"

প্রিয়নাথ শুনিয়াও শুনিল না, সাড়া দিল না। এতরাত্রে আসিয়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়নের মতো তাহার মন

নাই। গাঙ্গুলী আবার ডাকিলেন—"বলি কে চলেছ হে? সাড়া দাওনা কেন?"

অগত্যা প্রিয়নাথকে সাড়া দিতে হইল—"আজ্ঞে কাকা, আমি প্রিয়নাথ।"

গাঙ্গুলী বলিলেন—"কে, আমাদের প্রিয়নাথ? প্রিয়নাথ এসেছ? দাঁড়াও, দাঁড়াও বাবা, যাচ্ছি। ওরে, দোরটা খুলে দে, আমাদের প্রিয়নাথ এসেছে।"

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী যেন প্রিয়নাথেরই প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন এবং প্রিয়নাথেরও যেন আসিয়া এই বাড়ীতেই উঠিবার কথা। শশব্যস্তে লণ্ঠন হাতে করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। উঠানের দরজার আগড় খুলিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—"কই, ওখানে পথে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? এসো এসো, ভেতরে এসো।"

ভিতরে আসিবার দরজা যে এইমাত্র খোলা হইল, ও যে ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিল তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে যে পথের উপরই দাঁড়াইতে হয়, ইহা বৃদ্ধের মনে হইল না প্রিয়নাথও সে কথা বলিল না। বাল্যকাল হইতে এই সরল ব্রাহ্মণের কাছে সে আন্তরিক স্নেহ পাইয়াছে। সে-স্নেহের আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিল না, ইচ্ছা না থাকিলেও ভিতরে যাইতে হইল। প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পর সুখ দুঃখের কথা উঠিল। প্রিয়নাথকে বেশী কিছু বলিতে হইল না। গাঙ্গুলীর দীর্ঘ জীবনে শোক ও দুঃখের ঝুলি পরিপূর্ণ। বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় কথা আর তাঁহার ফুরাইতে চাহে না।

কথার ফাঁকে বার বার তিনি প্রিয়নাথকে দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিতে বলিলেন, হাত পা ধুইয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের অনুরোধও

একাধিকবার করিলেন। কিন্তু ইহার উপর আবার দাওয়ায় উঠিয়া বসিলে যে আজ রাত্রির অর্দ্ধেক গাঙ্গুলী-বাড়ীতেই কাটিয়া যাইবে তাহা প্রিয়নাথ বেশ জানিত। তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সে বুড়ার কথা শুনিতে লাগিল।

বস্তুতঃ, কথা তো সে শুনিতেছিল না, বুড়াকে কথা কহিবার অবসর দিতেছিল মাত্র। তাঁহার বুকের জমানো ভার নামাইবার উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়নাথের হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় গাঙ্গুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কী বাবা হাতে? কাপড় নাকি?"

প্রিয়নাথের আবার ভুল হইয়াছিল। কাপড়সুদ্ধ হাত লুকাইবার কথা তাহার মনে ছিল না। স্বীকার করিতে হইল উহা কাপড়ই বটে। গাঙ্গুলী লণ্ঠন আগাইয়া আনিয়া বলিলেন—"শাড়ী দেখছি যেন?"

অতএব প্রিয়নাথকে কাগজ খুলিয়া দেখাইতেও হইল। কাপড় হাতে করিয়া লণ্ঠনের স্বল্প আলোর সাহায্যে ও ক্ষীণ দৃষ্টির দ্বারা তাহার পাড় ও জমী নিরীক্ষণ করিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন—"দিব্যি কাপড়, খাসা পাড়। তা কত নিলে বাবা? একখানা আছে তো?"

প্রিয়নাথ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একখানাই। দু'টাকা সাড়ে তেরো আনা নিলে।"

অভাবের সংসারে দুই টাকা সাড়ে তেরো আনা অনেক পয়সা। দরিদ্র নবীন গাঙ্গুলী কাপড় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"তা নেবে বই কি? এমন সুন্দর কল্কার পাড় করেছে, পাড়েরই মেহনত কত।"

প্রিয়নাথ কাপড়টি আর কাগজে জড়াইল না। পাটসুদ্ধ পাকাইয়া হাতে ধরিয়া রহিল। সেই চক্‌চকে পাড়ের দিকে চাহিয়া একটি নিশ্বাস

ফেলিয়া নবীন গাঙ্গুলী বলিলেন—"আমার খুকি জ্বরের ঘোরে খালি বলতো—'বাবা, আমার একটাও ফুলপাড় শাড়ী নেই। এবার আমায় একখানা ফুলপাড় শাড়ী কিনে দিতে হবে।' বড্ড জ্বরে ভুগল কিনা। বিছানা ছেড়ে যে উঠবে সে ভরসা আর ছিল না। তা বলেছিলুম, মা ভালো হয়ে ওঠো, এবার জন্মদিনে যেখান থেকে পারি, একটা ফুলপাড় কাপড় তোমায় কিনে দেবই।"

আর একটি ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"কাল বাদে পরশু তার জন্মদিন, আর আজ আমার হাতে এমন পয়সা নেই যে একটা গামছা কিনে দি।—তা দাঁড়িয়ে রইলে বাবা, এতটা রাস্তা এসেছ, একটু বসবে না?"

প্রিয়নাথ হাতের কাপড়টা পাকাইতে পাকাইতে বলিল—"তা খুকি এখন বেশ সেরে উঠেছে তো?"

—"হ্যাঁ বাবা, তোমার বাপ্-মার আশীর্ব্বাদে তা সেরেছে বটে, তবে বড্ড কাহিল। ডাক্তার বলে—একটু বলকারক ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন গাঙ্গুলী মশাই।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের গলা ভারি হইয়া আসিল। কাশিয়া বলিলেন—"বলকারক। কোথায় পাব বাবা বলকারক? দিন্ চলে না তার ভালো খাওয়া দাওয়া। তুমিও যেমন।"

হাসিবার চেষ্টায় ঠোঁট দুইটি প্রসারিত করিয়া বলিয়া চলিলেন—"চোদ্দ বছর বয়স হলেও ছেলেমানুষ তো, তার ওপর সবে অসুখ থেকে উঠেছে। এক এক সময়ে বায়না করে। আবার নিজেই বোঝে, কী বুদ্ধি—এই আজই বিকেলে চোখ দুটি ছল ছল করে আমাকে বল্লে 'বাবা, এবারের জন্মদিনে ফুলপাড় কাপড় কিনো না, আসছে বছর কিনে

দিও। এখন আমি বড্ড রোগা, ভালো কাপড় নিয়ে পরতেই পারব না।' বুঝলে না, আমায় ভোলাচ্ছে? দেখ্‌ছে তো বাপের অবস্থা। আর যার আব্দরের জিনিষ ছিল, কোলের সন্তান ছিল, সেই তো চলে গেল, কার কাছে আব্‌দার করবে, তাই বুড়ো ভিখিরি বাপকে ভোলাচ্ছে, বুঝলে না?"

প্রিয়নাথ বুঝিতে লাগিল। মেয়ের কথা হইতে গাঙ্গুলীর স্বর্গগতা পত্নীর কথা আসিল। তারপর শেষ সম্বল কয় বিঘা জমী বন্ধক পড়িবার কথা আসিল। প্রিয়নাথ হুঁ, হাঁ, দিয়া একটির পর একটি সব বুঝিতে লাগিল। এই নিরন্ধ্র দুঃখের কাহিনীর জালে এমন ফাঁক পাইল না যে গলিয়া বাহির হইয়া আসে, অথচ জাল ছিঁড়িয়া আসিতেও কেমন যেন বাধে। কারণ, নবীন গাঙ্গুলীর দুঃখের কাহিনী শুধু দুঃখেরই কাহিনী। উহাতে কাহারও নিন্দা কুৎসা নাই, কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ নাই, আপন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকেও দায়ী করিবার প্রয়াসও নাই। আর নাই এই কাহিনী শুনাইয়া কোনও রকমের প্রার্থনার ইঙ্গিত। তাই, শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত প্রিয়নাথ বিদায় লইবার জন্য চঞ্চল হইলেও তিক্ত বোধ করিল না। সে জানে যে পল্লীগ্রামের সমাজে বাস করিয়াও নির্ব্বিরোধ সরলতা ও অকপট ভালোমানুষির দোষে এই শান্ত ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণের সঙ্গী কেহ নাই। দুঃখের বোঝা তাই ইঁহার অন্তরেই জমা হইয়া থাকে, অন্তরঙ্গ শ্রোতার অভাবে।

নিজের বাড়ীর দরজায় আসিয়া যখন প্রিয়নাথ দাঁড়াইল তখন পল্লী-গ্রামের হিসাবে রাত যথেষ্ট হইয়াছে। জ্ঞাতি সরিকদিগের সঙ্গে একত্রে তাহার বাড়ী। সদর দ্বার ও উঠান এজমালি। জেঠামহাশয়দিগের অবস্থাই

ভালো, অধিকাংশ ঘরই তাঁহাদের। ছেলে মেয়ে, লোকজন, গরু বাছুর লইয়া তাঁহারাই বাড়ী জমকাইয়া আছেন। উঠানে পা দিতে গোলা মরাই গোয়াল ভরিয়া যে লক্ষ্মীশ্রী চোখে পড়ে তাহা তাঁহাদেরই।

ডাকাডাকিতে কে একজন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া গেল। বুড়ী জেঠাইমা এখনও বাঁচিয়া আছেন। বুড়ী রাত্রে ভালো দেখিতে পান না। প্রিয়নাথের মাথায়, গালে ও বুকে হাত বুলাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর রোগা হইয়া যাওয়ার জন্য দুঃখ ও অনুযোগ করিলেন এবং মেয়েদের ডাকিয়া প্রিয়নাথের জন্য ভাত বাড়িয়া দিতে বলিলেন।

আহারের স্পৃহা মোটেই ছিল না, অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ সে উপরোধ এড়াইল। বলিল—"সন্ধ্যে-বেলায় হাওড়া ষ্টেশনে খেয়েছি জ্যাঠাইমা, খাবার-দাবার কিচ্ছু দরকার নেই।" হাওড়া ষ্টেশনে খাইবার কথা তাহার মিথ্যা নয়, এক কাপ চা সে সত্যই খাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু জেঠাইমা বুঝিলেন প্রিয়নাথ পেট ভরিয়া আহার করিয়া আসিয়াছে। তথাপি স্নেহময়ী বৃদ্ধা ছাড়িলেন না। হাত-পা ধুইয়া তাঁহার সামনে বসিয়া তাঁহার হাতের নারিকেল নাড়ু খাইতে হইল। তারপর প্রিয়নাথ নিজের ঘরে যাইবার জন্য উঠানে নামিল। বুড়ী আঁচলে চোখ মুছিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"আমার অদেষ্টে কি মরণ লেখনি হরি? কী অখণ্ড পের্‌মাই নিয়েই এসেছিলুম, ভূষুণ্ডির কাগের মতন বসে আছি!"

আলো-ভরা বৃহৎ উঠান পার হইয়া নিজের জীর্ণ ঘরটির সামনে আসিয়া প্রিয়নাথের বিবাহ-বার্ষিকীর যাত্রা শেষ হইল।

চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া প্রিয়নাথ মেজের উপর শাড়ী রাখিল, পকেট হইতে বাতি বাহির করিয়া জ্বালিয়া মাটীতে মোমের ফোঁটা ফেলিয়া

তাহার উপর বাতি বসাইল। তারপর নিজে মেজের বসিয়া ছোট চৌকিটি কাছে টানিয়া তাহার উপর হইতে মালতীর ছবিটি তুলিয়া লইল। ছবিটি লইয়া কোঁচার কাপড়ে তাহার ধুলা ঝাড়িয়া তাহাকে আবার চৌকির উপর স্থাপনা করিল। টেবিলে রাখিবার ফ্রেম, মালতীর সখেই কেনা। ছবি দাঁড়াইলে, প্রিয়নাথ ফুলের মালা বাহির করিয়া তাহার চারিদিকে জড়াইয়া দিল। এই হইয়া গেল তাহার বিবাহের স্মৃতি-উৎসব।

বার চারেক এ উৎসব অন্য রকমের হইয়াছিল। কিন্তু সে এ জগতের কথা নয়, সে মালতী চলিয়া গিয়াছে, সে প্রিয়নাথও বাঁচিয়া নাই। আর কিছু করিবার নাই। শাড়ীর কোনও ব্যবহার হইল না, তথাপি কেন যে শাড়ী কিনিয়া থাকে তাহা প্রিয়নাথ বলিতে পারে না। পাগলের পাগলামির অর্থ থাকে না। খাটের পায়াতে ঠেস্ দিয়া প্রিয়নাথ বসিয়া রহিল।

চোখে পড়িল দেয়ালের গায়ে সেই "ঝরা-মালতী।" তাহার উপরে লেখা "ঝরা-মালতী", তাহারও উপরে আবার "ঝরা-মালতী।" সবার উপরে লেখা রহিয়াছে শুধু "মালতী।" এ সকল মালতীর দুষ্টামির চিহ্ন। বিবাহের বছর চারেক পরের কথা, প্রিয়নাথের একদিন ইচ্ছা হইল মালতীর নাম সে দেয়ালে লিখিয়া রাখিবে, যেন ঘুম ভাঙ্গিলেই ঐ নাম তাহার চোখে পড়ে। মালতী দুষ্টামি করিয়া তাহার নামের আগে লিখিল "ঝরা।" প্রিয়নাথ রাগ করিল এবং দেয়ালের আর একটু উপরে লিখিল "মালতী।" তাহার রাগ দেখিয়া মালতীর খেলা বাড়িল। সে ইহাকেও "ঝরা-মালতী" করিল। আরও উপরে—সেখানেও এই ছোট চৌকির সাহায্যে মালতীর হাত পৌছিল। প্রিয়নাথেরও রোখ চাপিল, সে বাক্স তোরঙ্গর

উপর উঠিয়া অতি উঁচুতে লিখিল "মালতী।" তখন মালতীর দুষ্টামি হার মানিল—বাক্সর উপর প্রিয়নাথের নাম লেখা ছিল।

প্রিয়নাথ সেই "ঝরা-মালতী"র পানে চাহিয়া রহিল।

মাস কয়েকের ভিতরই মালতীর দুষ্টামি সত্য হইল। আসল মালতী যেমনই ঝরিল, সে ঝরা-মালতীকে এক রাত্রিও কেহ ঘরে রাখিল না। আর এই 'ঝরা-মালতী' আজ সাড়ে ষোল বৎসর দেয়ালের গায়ে ঠিক টিকিয়া আছে।

মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গা জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া মালতীর ছবির মালা দোলাইয়া দিল, বাতির শিখা নাচিয়া নাচিয়া মালতীর ছবির ছায়াটিকে দেওয়ালের উপর নাচাইতে লাগিল। ছবিটি ভিন্ন ঘরের সর্ব্বত্র নিরুপদ্রব ধূলির রাজত্ব। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-মন লইয়া প্রিয়নাথ বিমূঢ়ের মতো অনাবশ্যক ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে পড়িল ঘরের কোণে শাদা রঙের দীর্ঘ একটি কী বস্তু আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। সাপের খোলস। মাঠে নহে, ধানক্ষেতে নহে, মালতীর এই ঘরেই সাপের গতিবিধি আছে। সৌভাগ্যবশতঃ প্রিয়নাথ এ-ঘরে আর বাস করে না, তাই তাহাকে সাপে কামড়ায় না।

চাহিয়া চাহিয়া কখন এক সময় তাহার চোখের পাতা নামিয়া আসিল। কখন একসময় এক দমক হাওয়া আসিয়া বাতির লীলা শেষ করিয়া দিল। বাহিরে তখন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সহিত এ ঘরের কোনও সম্বন্ধ রহিল না। সে জ্যোৎস্না প্রিয়-নাথের জন্য নহে। সে অন্ধকারে আপন গৃহে হারানো স্বর্গে বসিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

* * *

মুরলী বলিল—"কি প্রিয়নাথদা, সত্যি আজই চলে এলে? আমি কিন্তু মনে করেছিলুম—"

প্রিয়নাথ বলিল—"হ্যাঁ, আজ আস্‌বই, কর্ত্তাকে তো বলে গিয়েছিলুম।"

মুরলী মাথা নাড়িয়া বলিল—"তা বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমি মনে করেছিলুম বৌদি কি আর আজই ছেড়ে দেবেন। তা দেখছি ছেড়ে দিয়েছে।"

মুরলী বলিল—"হ্যাঁ, ভালো কথা, আসল কথাই যে জিজ্ঞাসা করা হয় নি, শাড়ী পছন্দ হয়েছে কি না বলুন দিকি।"

প্রিয়নাথ বলিল—"শাড়ী তো চমৎকার, পছন্দ তো হবারই কথা। খুব খুশী হয়েছে।"

তাহার চোখের উপর ভাসিল গাঙ্গুলীর ছোট মেয়ে খুকীর আনন্দোদ্ভাসিত পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানি। সকালে আসিবার সময় প্রিয়নাথ খুকীকে ডাকিয়া তাহার হাতে শাড়ীটি দিলে দরিদ্র বালিকা বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন শুনিল এই আশাতীত অপরূপ সুন্দর শাড়ী তাহারই হইল, তখনও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গত রাত্রের কথা মনে করিয়া তিনি লজ্জার সহিত বলিলেন—"সত্যি বলছি প্রিয়নাথ, আমি তোমাকে তা মনে করে বলি নি বাবা।"

প্রিয়নাথ তাহাকে আশ্বস্ত করিল, সে কিছু মনে করে নাই। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন—"তবে কেন বাবা, অত দামের কাপড়টা ওকে দিয়ে নষ্ট করছ? তিন তিনটে টাকার একখানা কাপড়!"

গাঙ্গুলী অন্তর ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়নাথকে ছাড়িতে চাহিলেন না, ঘণ্টাখানেক বসিয়া যাহা হয় দুইটা শাক-ভাত

খাইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। জ্যাঠাইমার স্নেহের উপরোধ এড়াইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এই অনাত্মীয় গরীব ব্রাহ্মণের অনুরোধ প্রিয়নাথ হয় তো উপেক্ষা করিতে পারিত না; তাহাকে বসিতে হইত। কিন্তু গাঙ্গুলীর মেয়ে খুকি তাহাকে তাড়াইল।

বাঙ্গালা দেশের মেয়ের শিক্ষা বোধ করি তাহার অন্তর হইতে আসিয়া থাকে। প্রিয়নাথ দাদা হয়, গুরুজন। তাহার জন্মদিনের কাপড় কিনিয়া দিয়াছে। অতএব মাতৃহীনা খুকি, নিজের বিবেচনাতেই নূতন কাপড়টি পরিয়া লজ্জায় কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হইয়া প্রিয়নাথের পিছনে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু খুকির বাবা মেয়ের ইচ্ছা ও ভয় দুই-ই বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন—"ভয় কি, এগিয়ে আয়। দাদা হয়, তোর নিজের দাদাই তো, লজ্জা কি রে? দেখ দেখ প্রিয়নাথ, এমন ভীতু মেয়ে দেখেছ কখনো। তোমাকে পেন্নাম করতে আসবে, তা দরজা পেরিয়ে আসতে পারছে না, এ কোথাকার বোকা মেয়ে গো।" অনাবিল আনন্দে বুড়া নবীন গাঙ্গুলী ছেলে মানুষের মতো হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রিয়নাথ হাসিতে পারে নাই। ততক্ষণে তাহার পায়ের কাছে টকটকে লাল পাড়ের আঁচলটি গলায় দিয়া খুকি প্রণতা হইয়াছে।

এ বিপদের সম্ভাবনার কথা প্রিয়নাথ ভাবিয়া দেখে নাই। তাহার পায়ে যেন কে সূচ ফুটাইল। ত্রস্ত চঞ্চল পদে, কী যেন জরুরী প্রয়োজনের কথা বলিতে বলিতে সে প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পিছনে বিস্ময়-বিমূঢ় বৃদ্ধ ও বালিকার দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই।

মুরলী কি কাজে উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বৌদিকে বলেছেন তো যে তাঁর মুরলী ঠাকুর-পো পছন্দ করে জোর করে গছিয়ে দিয়েছে ?"

প্রিয়নাথ খোলা খাতায় শূন্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঘাড় নাড়িল। তারপর হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে খাতার পাতা ছাড়িয়া মুরলীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"মুরলীবাবু, কিছু মনে করো না ভাই, আমার স্ত্রী মারা গেছেন, আজ সাড়ে ষোল বছর হল। কাল আমাদের বিয়ের দিন ছিল, তা তো বলেছি। কিন্তু শাড়ী-টাড়ী ফুল-টুল কেন যে কিনি, তা নিজেও জানি না। ও আমার একটা পাগলামি।"

প্রিয়নাথ হাসিবার মতো মুখ করিয়া কলমে কালি লইয়া খাতায় দুর্গা নাম ফাঁদিতে সুরু করিল।

আর মুরলী অযথা হাসির কালিমা মুখে মাখিয়া তাহার কলমের পানে চাহিয়া রহিল।

(ভারতবর্ষ—ভাদ্র ১৩৪৯)

মায়ার খেলা

"ওমা! কী দুষ্টু ছেলে গো! আমি বলি বুঝি ঘুমিয়েছে। তা নয়, পিটির পিটির চাইছে যে গো। ঘুমো, দস্যি ছেলে, শিগ্‌গির ঘুমো।"

বলিয়া কল্যাণী গান ধরিল—"খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গী এলো দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।"

হাত চাপড়ানোর তালে তালে এই গান একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার গাওয়া হইল। কিন্তু তথাপি দুষ্ট ছেলের চোখে বোধ করি তন্দ্রাবেশের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ছেলের মা কহিল—"ফের দুষ্টুমি করছ খোকন? না, এখন আর মিনু খায় না, নক্ষী ছেলে, এখন ঘুমোতে হয়। সোনা ছেলে, মাণিক ছেলে, ঘুমোও তো বাবা। কি? গরম হচ্ছে? আমি এই হাওয়া করছি, ঘুমোও।"

খোকনের মা পাখা নাড়িতে নাড়িতে আবার গান ধরিল—"খোকন আমাদের সোনা, স্যাকরা ডেকে, মোহর কেটে..."

পাশের ঘর হইতে কে ডাকিলেন—"কল্যাণি, উঠেছিস?" সাড়া না পাইয়া আবার ডাক আসিল—"অ কল্যাণি।"

খোকার মা স্বগত চাপা গলায় কহিল—"উঠ্‌ব আবার কি? ঘুমোতে কি দিয়েছে দস্যি ছেলে, যে উঠ্‌ব?"

আবার স্বর আসিল—"অ কল্যাণি, আর ঘুমোয় না, ওঠ্ মা, চুল বাঁধবি আয়।" বলিতে বলিতে এক বর্ষীয়সী মহিলা এ ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী বলিল—"তোমরা তো আমাকে খালি ঘুমোতেই দেখছ—ওমা ওমা, দেখ দেখ, দুষ্টু ছেলের কাণ্ড দেখ। ওমা দেখ না।"

কল্যাণীর মাতা হাসিয়া বলিলেন—"কী আবার কাণ্ড করলে তোর ছেলে?"

কল্যাণী বলিল—"দেখ দেখ, কী রকম পিটির পিটির করে চাইছে দেখ মা। ঐটুকু ছেলে, কী রকম দুষ্টু দুষ্টু চাউনি মা, ঠিক যেন পাকা বুড়ো।"

পরিপক্ক বৃদ্ধদিগের চাহনি দুষ্ট হয়, এ খবর কল্যাণী কোথা হইতে পাইল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু কল্যাণীর মাতা কন্যার জ্ঞানের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিলেন না। কল্যাণীর ছেলের দিকে একবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোর ছেলে তুই দেখ। আমার এখন ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে। কিন্তু ছেলে নিয়ে শুয়ে থাকলে তো চলবে না, বেলা গেছে, উঠে আয়, চুল বেঁধে জামা কাপড় পরে নে। এখুনি তো সব আসবে ডাকতে।" বলিয়া চিরুনী লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কল্যাণী উঠিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার খোকনের দিকে চাহিয়া তাহার আর উঠা হইল না।—"না, না, এই যে আমি, আবার কান্না কেন? কে বকেছে, আমার খোকনকে কে বকেছে।" বলিয়া পুনরায় ছেলের গায়ে হাত দিয়া কল্যাণী শুইয়া পড়িল। অভিমানী শিশুকে ভুলাইবার জন্য বাঙ্গলা দেশের মায়েদের শব্দ-শাস্ত্রে যত আদরের কথা আছে, তাহার প্রায় সবই শুইয়া শুইয়া কল্যাণী বলিয়া গেল। কিন্তু তাহার খোকন নিশ্চয় অত সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। ছেলের অভিমান প্রকৃত কি কাল্পনিক, তাহা ছেলের মা-ই জানে, কিন্তু কল্যাণীকে ছেলে কোলে করিয়া উঠিতে হইল। সে ছেলেকে কখনো বুকের উপর শোয়াইয়া, কখনো কটিতটে বসাইয়া, ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ ছড়া আবৃত্তি

করিতে লাগিল এবং বিবিধ উপায়ে সন্তানের অভিমানে জননীর কাতর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বাহির হইতে বার বার কল্যাণীর মায়ের আহ্বান আসিল। কিন্তু স্বয়ং মায়ের ভূমিকা লইয়া নিজের মায়ের কথা সে তখন ভুলিয়া গিয়াছে।

কিছু পরে যখন পাশের বাড়ীর শোভা, কল্যাণীর শৈশবের বন্ধু, সাজিয়া গুজিয়া নিত্যকার মতো তাহাকে ডাকিতে আসিল, তখনো কল্যাণী ছেলেকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। শোভা ঘরে ঢুকিতেই কল্যাণী নিজের ওষ্ঠে আঙ্গুল ঠেকাইয়া তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল। শোভা পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে আগাইয়া আসিলে কল্যাণী চুপি চুপি বলিল—"তোরা যা ভাই, আজ আমার যাওয়া হবে না।"

শোভা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই ?"

কল্যাণী কহিল—"না ভাই, আমার খোকনসোনাকে কার কাছে রেখে যাব বল ? সারা দুপুর দস্যিপানা ক'রে এই সবে একটু চোখ বুজেচে।"

শোভা খোকার মুখের দিবে চাহিয়া বলিল "তা এখন তো বেশ ঘুমিয়েছে, শুইয়ে রেখে এই বেলা একটু আয় না।"

কল্যাণী বলিল—"ও বাবা, এক্ষুণি উঠে আমাকে দেখতে না পেলে একেবারে কুরুক্ষেত্তর করবে। এই কত কেঁদে কেঁদে একটু চুপ করেচে। না ভাই, তুই যা।"

শোভা বিমর্ষ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বন্ধুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"মাসীমা কাল সকালে চলে যাবেন, তোর গান শোনবার জন্যে কখন থেকে বসে আছেন। তুই একবারটী যাবি না ? রেখা, বুলা সব এসে বসে আছে।"

কল্যাণী একটু ভাবিল। তারপর বলিল—"আচ্ছা যাব, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না ভাই।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহাতেই হইবে। তার পর ধীরে ধীরে খাটের ধারে বসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—

"আমি একটু খোকনকে নেবো ভাই? তুই ততক্ষণ গা ধুয়ে আসবি?"

কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না, না, এক্ষুণি তা হলে উঠে পড়বে; এখন ওকে জাগাস নি ভাই, তা হলে আর আমার কোনো কাজ হবে না।"

শোভা হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত লুব্ধ দৃষ্টিতে কল্যাণীর খোকনের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর একটী নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল।

এই দুইটী বন্ধুর কাহারও মনের কোনো কথা অপরের কাছে গোপন থাকিত না। শোভাদের অবস্থা ভালোই, বরং কল্যাণীদের চেয়ে বেশী ভালো। জামা, কাপড়, স্নেহ, আদর, কিছুরই অভাব শোভার ছিল না। কিন্তু যেদিন কল্যাণীর এই পরম প্রিয় খোকন লাভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে শোভার মনে হইয়াছে, তাহার সব থাকিয়াও কিছুই নাই। কল্যাণীর খোকনের মতো একটী মনোহরদর্শন খোকন না থাকিলে জীবনে খেলা ধূলা, আমোদ-আহ্লাদ কিছুই কিছু নয়।

বন্ধুর মনের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার দুঃখ কল্যাণীর অজানা ছিল না। সে একবার মনে করিল শোভাকে ডাকিয়া খোকনকে তাহার কোলে তুলিয়া দেয়। কিন্তু তখন শোভা দরজার কাছে চলিয়া গিয়াছে, কল্যাণীর ডাকিবার আগেই সে বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী নিজের মনে কহিল "রাগ করলে বোধ হয়। করলে তো করলে। তা বলে এখন আমি ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে পারি না বাবু।"

মা হিসাবে কল্যাণী ছোট হইলেও সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি কোনো বয়োবৃদ্ধা মায়ের চেয়ে কম জাগ্রত নয়। মাতৃ-জাতির কর্ত্তব্যে সে কখনো সাধ্যমত অবহেলা ঘটিতে দেয় না। দিনে রাতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে, কেবল ছেলের চিন্তাতেই তাহার মন নিযুক্ত থাকে। স্নানাহার ইত্যাদির জন্য যেটুকু সময় তাহাকে ছেলের কাছ হইতে দূরে থাকিতে হয়, সে সময় তাহার কিছুই ভাল লাগে না। দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা ছেলেকে কোলে রাখিতে পারিলে তবে বুঝি তাহার তৃপ্তি হইত। প্রতিনিয়ত ছেলের হাসি কান্না সুবুদ্ধি ও দুষ্ট বুদ্ধির নানা পরিচয় কল্পনার চোখে দেখিয়া সে শুধু নিজেই মুগ্ধ হয় না, বাড়ীর সকলকে সেই সব বিবরণ ডাকিয়া ডাকিয়া শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ইহার জন্য বড়দের কাছে তাহাকে কম তিরস্কার লাভ করিতে হয় না এবং শোভার মতো যে সকল অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সঙ্গলাভ করিতে পায় না, তাহাদের পরিহাস ও অভিমান অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে।

শোভা চলিয়া গেলে সে বড় খাট হইতে নামিয়া রেলিঙ্‌ ঘেরা ছোট্ট খাটে তাহার ছেলেকে শোয়াইয়া দিল ও কাঁথা ইত্যাদিতে সযত্নে ছেলের গা ঢাকা দিয়া ক্ষুদ্র মাথার বালিশটা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া মনে করিল এইবার ঠিক হইয়াছে, সে যাইতে পারে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও কল্যাণী দাঁড়াইয়া রহিল, সেই ছোট বিছানাটীর উপর, সেই অতি ছোট মুখখানির দিকে চাহিয়া।

চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল, বেচারী শোভা! তাহার যে লোভ তাহা অতি স্বাভাবিক। তাহার খোকন-সোনার মত এমন লোভনীয় সামগ্রী আর কিছু আছে কি? তবু শোভার তো কত কী আছে। তাহার যে খোকন ছাড়া আর কেহই নাই। বন্ধুরা রাগ করুক, ঠাট্টা

করুক, কিন্তু শীঘ্রই একদিন এই ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, এবং তারপর একদিন ছেলের বিবাহ উপলক্ষে সে যে অভূতপূর্ব্ব খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিবে তাহা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া থাকিবে।

খোকন ব্যতীত তাহার আর কেহ নাই, এরকম চিন্তা করিবার কল্যাণীর ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণ নাই। স্বামী ও শ্বশুরবাটী না থাকিলেও তাহার বাপ, মা, ভাই, বোন সকলেই আছেন। ভাই বোনেদের মধ্যে সে-ই তাহার বাবার প্রিয়তম সন্তান। শিশুকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার যত কিছু আবদার ও ইচ্ছা বাবার কাছেই পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি খোকন-রূপ পরম সম্পদ লাভ করিবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে তাহার ভাবিতে ভালো লাগিত যে তাহার কেহ নাই, শুধু খোকন আছে। সে রকম সময়ে ছেলের আদর মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। এমন কি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাক্‌শক্তি থাকিলে কল্যাণীর খোকন নিশ্চয় যখন তখন এই আদরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিত।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কল্যাণী নীচে নামিয়া গেল। মিনিট দশেক পরে তাহার ছোট ভাই বিশু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরের ভিতর ক্ষুদ্র খাটের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিশু উৎফুল্ল হইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। তারপর বোধ করি দিদির ক্রুদ্ধ মুখ স্মরণ করিয়া সে বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—"দিদিভাই, তোমার ছেলেকে একবারটী নোবো ?"

নীচে কলতলায় মুখে সাবান ঘষিতে ঘষিতে কল্যাণী উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল—"না বিশু, তুই ফেলে দিবি, নিস নি।"

মায়ের কোলের ছেলে বলিয়া বিশু এ বাড়ীর আদুরে ছেলে। তাহার বয়স ছ'বছর হইল। কিন্তু মাতৃবলে বলীয়ান থাকায় সে কাহাকেও ভয়

করে না। দিদির উত্তর শুনিয়া বিশু খুশী হইল না। সে আর ছোট নয়, এত বড় হইয়াছে। অথচ তবুও দিদি যে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতে দেয় না, ইহাতে সে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিয়া থাকে। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"একবারটী নিই দিদিভাই, ফেলে দোবো না, একটু খেলা করব।"

শুনিয়া কল্যাণীর উদ্বেগ বাড়িয়া গেল। সে বিশুর অপেক্ষা চীৎকার করিয়া বলিল—"তোমার তো অত খেলনা, গাড়ী রয়েছে, আমার ছেলেকে না নিলে বুঝি তোমার খেলা হয় না?"

বিশু জবাব দিল না। খেলনা, গাড়ী ইত্যাদি তাহার অনেক আছে সত্য, কিন্তু আজকাল দিদির ছেলেটীকেই যে তাহার সবচেয়ে ভালো লাগে, একথা যে কেন দিদি বোঝে না কে জানে!

বিশুর সাড়া না পাইয়া তাহার দিদি আবার হাঁকিয়া বলিল—"খবরদার বিশু, মেরে পিঠ ভেঙ্গে দোবো, যদি আমার ছেলের গায়ে হাত দাও।"

ভয় দেখাইতে গিয়া কল্যাণী ভুল করিল। বিশুর পৌরুষে ঘা পড়িল। সে ক্ষণকাল ঘাড় কাত করিয়া ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মৃদু স্বরে, যাহাতে নীচে দিদির শ্রুতিগোচর না হয়, বলিল—"হ্যাঁ নোবো।"

ঘাড় কাত করিয়াই শুনিল দিদি প্রতিবাদ করিল না। তখন উৎসাহিত হইয়া আরও মৃদুস্বরে নিজের সঙ্কল্প আবার ঘোষণা করিল—"বেশ করব নোবো।" বলিয়া নির্ভীক পদক্ষেপে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

* * * *

ইহার পরের ঘটনা অতি নিদারুণ হইলেও সংক্ষিপ্ত। "বিধিলিপি", "দৈব-দুর্বিপাক" ইত্যাদি যে সকল সাধু ভাষার প্রচলন আমাদের কেতাবে পাওয়া যায়, বহু ব্যবহারে সেগুলি অতি সাধারণ ও সস্তা হইয়া গেলেও, মানুষের নির্ম্মম ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা বলিতে গেলে সেই সকল সাধু ভাষার সাহায্য লওয়া ছাড়া লেখকদিগের আর কী উপায় আছে। সতত উদ্বিগ্ন স্নেহ ও ঐকান্তিক শুভ ইচ্ছা, সব ডিঙ্গাইয়া যখন আকস্মিক বিপদ আসিয়া স্নেহের বস্তুকে গ্রাস করে, তখন বিধিলিপি না বলিয়া আর কী বলিতে পারা যায়।

ঘটনা যখন সংক্ষিপ্ত, তখন সংক্ষেপেই তাহা বলি।

ছেলেকে শোয়াইয়া গিয়া কল্যাণী নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহার উপর, কখন ছেলে তাহার দুর্দ্দান্ত বিশুর কবলে পড়িয়া যায় এই ভয় তাহাকে উদ্বিগ্ন করিল, চুল বাঁধা আর হইল না। মায়ের বকুনি নীরবে সহ্য করিয়া, কোন রকমে গা ধোওয়া, জামা কাপড় পরা ও জলযোগ সারিয়া কল্যাণী যথাসাধ্য শীঘ্র উপরে আসিতেছিল। এমন সময় বিলাতী ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের বাজনা শুনিতে পাওয়া গেল। তখন বিবাহের মাস। পথ দিয়া বর ও বরযাত্রীর মিছিল যাইতেছে বুঝিয়া কল্যাণী ছুটিয়া আসিল।

সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে তাহার মনে হইল সেও ছেলের বিবাহে বিলাতী ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের বাজনা আনাইবে। কিন্তু ছেলের বিবাহ কবে হইবে? তাহার আগে ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কিছু বাদ্যভাণ্ডের ব্যবস্থা করিলে হয়। আজই রাত্রে একবার কথাটা বাবার কাছে তুলিবে মনস্থ করিয়া কল্যাণী উপরে আসিল।

উপরে উঠিয়াই চোখে পড়িল—যে ঘরে ছেলেকে শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল সে ঘরের দরজা খোলা। তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের

ভিতর অন্ধকার। ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া কল্যাণী দেখিল যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইয়াছে। তাহার ছেলের খাট শূন্য। ছেলের বিছানার ছোট ছোট কাঁথা, বালিশ ইত্যাদি ইতস্ততঃ ছড়ানো।

বিশুর হাতে পড়িয়া ছেলেকে অক্ষত পাওয়া যাইবে কি না এই দুশ্চিন্তায় কল্যাণী সন্ত্রস্ত হইয়া ডাকিল—"বিশু, বিশু।"

কিন্তু তখন বিবাহের বাজনা আরও কাছে আসিয়াছে। তাহার প্রবল ও বিচিত্র শব্দে কল্যাণীর ডাক ডুবিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ধান লইবে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইল না। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় কল্যাণী কয়েক মুহূর্ত এ ঘরে ও ঘরে 'বিশু' 'বিশু' বলিয়া ডাকিয়া ফিরিল। বিলাতী ব্যাণ্ড তাহার বিশাল ঢাক সমেত তখন তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছে। সেই ঢাকের গুরু শব্দে তাহার বুকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া উঠিল। বিশু কোথায় গিয়াছে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল নিশ্চয় সকলে বর দেখিবার জন্য পথের দিকের লম্বা বারান্দায় গিয়া জমিয়াছে এবং বিশুকেও সেই খানে পাওয়া যাইবে। স্খলিত অঞ্চল কোমরে জড়াইতে জড়াইতে সে ছুটিল পথের ধারের বারান্দার দিকে।

বারান্দার রেলিঙের উপরে সারি সারি নরমুণ্ড। কিন্তু সে সকল কিছুই কল্যাণী দেখিল না, শুধু দেখিল তাহাদের মধ্যে বিশু নাই।

কিন্তু সে তাহার ব্যস্ততার ভ্রম। বারান্দার প্রান্তে আসিয়া দেখিতে পাইল অপর প্রান্তে বিশু রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া পথের দিকে দেখিতেছে, তাহার কোলে যেন কী রহিয়াছে।

দিদির ছেলে সে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং দিদি যে শাবকহারা

বাঘিনীর মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা বিশুর মনে হয় নাই। মনে করিবার অবসরও নাই। ঠিক সেই সময়ে বরের গাড়ী বারান্দার নীচে আসিয়া পৌঁছিল। ছোট্ট বিশু ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া, রেলিঙের ফাঁকে ফাঁকে তাহার ছোট ছোট পা ঢুকাইয়া উঁচু হইয়া ঝুঁকিল নীচের দিকে চাহিয়া। তখনও সে দিদির ছেলেকে এক হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

বাড়ীর সকলেই তখন বর দেখিতে ব্যস্ত, বিশুর প্রতি কাহারো নজর নাই। মিছিলের অগণিত বাতির আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া সকলের মুখের উপর পড়িতেছে ও সরিয়া যাইতেছে। যাহারা বর দেখিতে পাইয়াছে তাহারা আঙ্গুল বাড়াইয়া সেই বর পরস্পরকে দেখাইতেছে। বেচারা বিশু তখনো বরকে নিরূপণ করিতে পারে নাই। চোখের নীচে দিয়া যে বর তাহাকে দেখা না দিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইতেছে, সেই বরকে দেখিবার প্রাণপণ প্রয়াসে বিশু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্তে কল্যাণী বিশুর প্রায় পিছনে আসিয়া পড়িল।

বিশুও সেই মুহূর্তে অধীর আগ্রহে এবারে দুই হাতে রেলিঙ ধরিয়া আরও উঁচু হইয়া রেলিঙের উপর দেহ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং সেই মুহূর্তে কল্যাণী দেখিল বিশুর মাথার ওপাশে এতক্ষণ যে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল মুখখানি উজ্জ্বল বাতির আলোকে চক্‌চক্ করিতেছিল, সেই মুখখানি অদৃশ্য হইল। কল্যাণী রেলিঙ ধরিয়া আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা, আমার ছেলে!"

৭

শোভাযাত্রীর দল তাহাদের বিবিধ বাজনা ও বিপুল আলোর সমারোহ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোন্ মোটর গাড়ার চাকার তলায়

কাহার কী প্রিয়বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, তাহার সংবাদ বরও জানিল না, বরযাত্রীরাও জানিল না। অত আলোর পর পথ যেন অন্ধকার দেখাইতেছে। দূর হইতে বাজনার শব্দ তখনো আসিতেছে, কিন্তু তত প্রবল নয়। সে শব্দকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে কল্যাণীর কাতর আর্ত্ত ক্রন্দন। পথের উপর বুক দিয়া পড়িয়া কল্যাণী হাত-পা ছুঁড়িয়া পাগলের মত কাঁদিতে লাগিল। আর দুরন্ত বিশু অত্যন্ত অপরাধীর মত অতি ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দিদির কান্না দেখিতে লাগিল।

* * * *

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করিল—"কী রকম পড়লে গল্প ?" অনিমেষের স্ত্রী জবাব দিলেন না। অনিমেষ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কী গো, গল্পটা কেমন লাগল ?"

অনিমেষের স্ত্রী ম্লানমুখে বলিলেন—"ছাই গল্প।" তারপর সহসা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আপন মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে "ষাট, ষাট" বলিয়া অনিমেষ-গৃহিণী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন "শম্ভু, খোকাকে দিয়ে যাও আমার কাছে।"

অনিমেষও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া বলিল—"তোমার ভালো লাগল না ?" তাহার পত্নী বলিলেন—"কী বাপু বিচ্ছিরি করে শেষ করলে, ও আমার ভাল লাগে না।"

অনিমেষ বলিল—"ঐ যাঃ, আর একটা পাতা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। এই নাও। গল্পের উপসংহারটুকু এতে আছে।"

কিন্তু অনিমেষের স্ত্রী উদ্যত কাগজের দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না।

বলিলেন—"ও থাকগে।"বলিয়া কণ্ঠ আরও একগ্রাম চড়াইয়া ডাকিলেন—"ও শম্ভু, খোকাকে নিয়ে এস না দুধ খাবে।"

অনিমেষ বলিল—"এই তো খোকা দুধ খেলে।"

"তা হোক", বলিয়া তাহার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"শম্ভু-উ।"

অনিমেষ বলিল—"আচ্ছা, খোকাকে আমি আনছি, তুমি ততক্ষণ কাগজটা পড়ো। একটুখানি আছে।"

উপরোধ্ এড়াইতে না পারিয়া অনিমেষ-গৃহিণী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই কাগজখণ্ড লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

* * * *

তখন কল্যাণীর কান্নার শব্দে তাহার বাবা বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে না পারিয়া, জোর করিয়া কোলে তুলিয়া বাহিরের ঘরে ফরাসের উপর শোয়াইয়া দিলেন। সেখানে বাপের সস্নেহ সান্ত্বনায় কল্যাণী ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল সুখের দিনের পরিকল্পনা করিয়াছিল সেই সকল বলিতে লাগিল। সেই আশাভঙ্গের কথা বলিতে গিয়া তাহার কান্না দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কল্যাণীর বাবা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার দাদাকে ডাকিলেন এবং একটু পরে কল্যাণীর দাঁদা গম্ভীর মুখে সাইকেল চাপিয়া দ্রুত কোথায় যেন গেলেন।

কয়েক মিনিট পরে,—তখনো কল্যাণীর ক্রন্দন প্রায় সমান বেগে চলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার মাতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে,—কল্যাণীর দাদা আর একটী বড় ডলি পুতুল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং কল্যাণীর সম্মুখে পুতুলটী বসাইয়া দিয়া, তাহার পৃষ্ঠে একটী কীল মারিয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী কিন্তু গ্রাহ্য করিল না। সে কান্না থামাইয়া উঠিয়া বসিল এবং নূতন ও পুরাতন দুইটী পুতুল মিলাইয়া দেখিল। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, স্নেহময়ী জননীর মতোই সস্নেহে নবাগতকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। যাইবার সময় পুরাতন দলিত মথিত সন্তানটী বিশুকে দান করিয়া গেল।

কিন্তু কল্যাণী থামিলেও তাহার মা থামিলেন না। তিনি বাহিরের ঘরে আসিয়া কল্যাণীর বাবাকে ভৎসনা করিলেন—

"আবার একটা পুতুল কিনে দেওয়া হল? টাকাগুলো তোমার কামড়াচ্ছিল, নয়? ভুগবে ঐ মেয়ে নিয়ে তুমি, এই বলে রাখলুম। আট বছর বয়েস হল, আদর যেন ধরে না। রাস্তায় শুয়ে শুয়ে কান্না!"

* * * * *

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করিল—"কী রকম লাগল? হ্যাগা?"

অনিমেষগৃহিণী হাস্যোজ্জ্বলমুখে উত্তর দিলেন—"বেশ গল্প। তুমি এতও জানো বাপু।"

অনিমেষ বলিল—"খোকাকে নিয়ে আসি।"

খোকার জননী বলিলেন—"না, থাকগে। শম্ভুর কাছে আছে, খেলা করছে থাক। আমার কাছে এলেই দস্যিপানা করবে।"

(ভারতবর্ষ—শ্রাবণ ১৩৪৯)

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা